মাসিক
দা'ওয়াহ
THE MONTHLY DA'WAH
مجلة الدعوة الشهرية
www.monthlydawah.com
১ম বর্ষ; ৫ম সংখ্যা | নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী | কার্তিক ১৪২৬ বাংলা | রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

মুহাম্মদ (সা.) আমাদের আদর্শ

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান ◆ সাংবাদিকতাও হতে পারে নবীওয়ালা কাজ
টেমস নদীর মোহনায় মুহাম্মদ (সা.) ◆ এক মহিয়সী মায়ের শৈশব

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

مجلة الدعوة الشهرية

السنة الأولى، العدد الخامس، نوفمبر ٢٠١٩م/ ربيع الأول ١٤٤١هـ

تصدر من قسم الدعوة والدراسات الإسلامية

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (এম.পি)

প্রফেসর ড. মোহা: শাফী উদ্দীন মাদানী

প্রফেসর ড. শাকের আলম শওক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

জনাব মোহা: শাহজালাল

সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক

নির্বাহী সম্পাদক

আ.ফ.ম নূরুজ্জামান

সহযোগী সম্পাদক

- জাকিয়া বিনতে আলম
- শোয়াইব মাক্কী
- সাইয়্যেদ নূর
- সাইয়্যেদ মাহমুদুল হাসান

সম্পাদনা সহযোগী

- আ.ক.ম বদরুজ্জামান
- আছিয়া বেগম
- শরীয়তুল্লাহ
- হাদিকাতুল কুবরা
- আমান উল্লাহ
- মারজানাহ

মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা | Price : 5$

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াহ

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৭১৬ ১৪৯৫৫২

ই-মেইল ঃ monthlydawah@gmail.com

ওয়েব ঃ www.monthlydawah.com

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি থেকে প্রকাশিত এবং আল-নূর কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আনছারী প্লাজা (৩য় তলা), ৩২ নজির আহমদ চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।

The Monthly Dawah

1st Year; 5th Issue | November 2019

Monthly Dawah is a magazine published by the Department of Dawah and Islamic Studies of International Islamic University Chittagong, Bangladesh. Objectives of this Magazine are:

- To highlight the teaching of Islam to the people in general.
- To inspire all to have the real Islamic teachings.
- To present the great ideal of Islam.
- To spread the concept of moderate Islam by highlighting the stand of Islam against all kind of extremism & terrorism.

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক দা'ওয়াহ।

মাসিক দা'ওয়াহ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে,

- সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরা।
- কুরআন সুন্নাহর সহিহ শিক্ষা গ্রহণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ইসলামের সুমহান আদর্শকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।
- জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থানকে তুলে ধরে মধ্যপন্থার চেতনাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

সমাজের সকল অনাচার দূর করতে পারে রাসূল (সা.) এর আদর্শ ♦ ০৩

দারসুল কুরআন

মুমিন জীবনে "হিকমাহ" বা "সুন্নাহ" অনুসরণের আবশ্যিকতা
- শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান আযহারী ♦ ০৪

দারসুল হাদীস

ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার পদ্ধতি
- সাইয়্যেদ নূর আল আযহারী ♦ ০৭

প্রবন্ধ

মুহাম্মদ (সা.) আমাদের আদর্শ
- ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক ♦ ০৯

ঈদে মিলাদুন্নবী
- প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাফী উদ্দীন মাদানী ♦ ১৪

টেমস নদীর মোহনায় মুহাম্মদ (সা.)
- শায়খ মাহমুদুল হাসান ♦ ১৮

প্রেমের মিনারে তোমাকে চাই
- নুর উদ্দীন শরীফ ♦ ২১

শিশু চরিত্র গঠনে বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ
- মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ♦ ২৩

এক মহিয়ষী মা-এর শৈশব
- জিয়াউল হক ♦ ২৫

রাসূলের সাথে দিনাতিপাত
- উম্মে সায়েমা তাযকিয়া ♦ ২৭

তিনি আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.)
- নেকনুর আরা রিমা ♦ ৩০

রাসূল অবমাননার শাস্তি
- আবু জোবায়ের ♦ ৩২

ইসলাম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান
- প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী ♦ ৩৪

বই পরিচিতি

সীরাতুন নবী (সা.) ♦ ৩৯

নিবন্ধ

সাংবাদিকতাও হতে পারে নবীওয়ালা কাজ
- ড. আবুল কালাম আজাদ ♦ ৪১

শোকর ও কৃতজ্ঞতা : ফযীলত ও পদ্ধতি
- এম হামেদ হাছন ♦ ৪৩

সমকালীন প্রসংগ

আবরার ফাহাদ হত্যা ঃ একটি পর্যালোচনা
- ডা. মোহাম্মদ ওমর ফারুক ♦ ৪৭

হেদায়েত

মুসলিম হওয়ার গল্প-(২)
- মুহাম্মদ নূরন্নবী ♦ ৪৯

মাসায়েল

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার বিধান
- মোঃ শাহ জালাল ♦ ৫১

কবিতা ♦ ৫৩

ক্যাম্পাস সংবাদ ♦ ৫৫

কুইজ কনটেস্ট ♦ ৫৬

সম্পাদকীয়

সমাজের সকল অনাচার দূর করতে পারে রাসূল সা. এর আদর্শ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন আরবের বুকে এলেন তখন গোটা আরব জাহান ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপাচারে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল আরবের প্রতিটি অলি-গলি। আইয়ামে জাহেলিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছিল আরবের সেই অন্ধকার দিনগুলি।

আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ (সা.) কে আলোক বর্তিকা হিসেবে প্রেরণ করলেন। তিনি আরব জাহানকে পরিচ্ছন্ন করার মিশনে নেমে গেলেন। অন্ধকার যুগকে আলো দিয়ে আলোকিত করতে হবে এটাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তিনি আরব জাহানের পরিবর্তনের জন্য উত্তম চরিত্রকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। তাঁর উত্তম চরিত্রে বিমোহিত হয়ে মানুষেরা সত্যকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। নবুওয়তের প্রকাশ্য ঘোষণার আগেই মুহাম্মদ (সা.) আল-আমীন বা বিশ্বস্ত খেতাবে ভূষিত হলেন। সেই আল-আমীন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে গোটা আরব জাহানের অন্তরে ঢুকে গেলেন।

নবী মুহাম্মদের (সা.) কথা-কাজ, হাসি-কান্না, হাটা-চলা, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন সবকিছু মানুষের অন্তরকে ছুঁয়েছিল। তিনি হয়ে উঠলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সাইয়্যেদুল মুরছালিন হলেন আদর্শের সাইয়্যেদ। স্ত্রীদের কাছে তিনি আদর্শ স্বামী। ছাত্রদের কাছে তিনি আদর্শ শিক্ষক। কর্মীর কাছে তিনি আদর্শ নেতা। যুদ্ধের ময়দানে আদর্শ সেনাপতি তিনি। ইবাদত-বন্দেগী, পরহেযগারিতা, কৃচ্ছতা কোন্ সেক্টরের কথা বলবেন আপনি? এমন কোনো সেক্টর বাদ রাখেননি যেখানে তিনি আদর্শের ছাঁয়া ফেলেননি।

বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি কম সাধিত হয়নি। মানুষ এখন মূহুর্তেই সবকিছু করে ফেলছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যোগাযোগ করছে চোখের পলকে। চোখ ধাঁধানো আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকাগুলোতে কী নেই বলুন? শিক্ষা-দীক্ষা, প্রযুক্তি, আরাম-আয়েশ বিলাসিতার চরম শিখরে পৌঁছেছে বর্তমান যমানার মানুষ। কিন্তু নীতি- নৈতিকতা বলতে কি কিছু আছে? চারদিকে খুন, রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, মাদকতা, সুদ-ঘুষ, অন্যায়-অবিচারে ডুবে গেছে গোটা মানব সমাজ। মা মেয়েকে খুন করছে। মেয়ে খুন করছে মা-বাপকে। লাশের উপর নৃত্য করছে মানব নামের হায়েনারা। শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না পাশবিকতা থেকে। বৃদ্ধারাও ধর্ষিতা হচ্ছে পথে ঘাটে।

আমাদের সমাজের সকল প্রকার অনাচার দূর করতে রাসূল (সা.) এর আদর্শই একমাত্র সমাধান। আমরা যদি রাসূল (সা.) কে আমাদের জীবনের পরতে পরতে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের সমাজও পরিণত হতে পারে আলোকিত সমাজে। আসুন আমরা রাসূল (সা.) এর জীবনী পাঠ করে তাঁর আদর্শে আমাদের জীবনটাও সাজানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন।

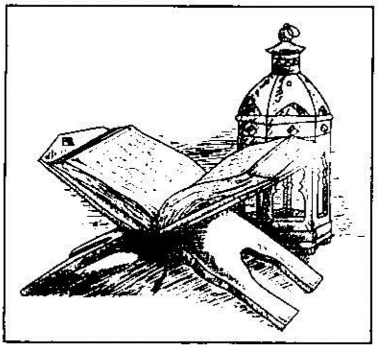

মুমিন জীবনে "হিকমাহ" বা "সুন্নাহ" অনুসরণের আবশ্যিকতা

শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান আযহারী
ইমাম ও খতীব,
বাইতুল মামুর মসজিদ কাভোরিতেন, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া, ইউরোপ।

শুরু কথা

আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহানবী (সা.) এর সুন্নাহকে "হিকমাহ" বলে অভিহিত করেছেন। যদিও "হিকমাহ" শব্দের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। তবে শব্দটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। একজন মুমিন তার ইসলামী জীবনকে সমৃদ্ধ করতে যতগুলো মৌলিক কর্মসূচী নিয়মিত চর্চা করে থাকে, তন্মধ্যে সুন্নাহ অধ্যয়ন ও তা যথা সম্ভব বাস্তবায়ন অন্যতম। আজকের দারসে আমরা "সুন্নাহ" অনুসরণের গুরুত্বের ব্যাপারে সূরা "আন-নূরের" ৬৩ নং আয়াত নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আয়াতে কারীমা

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ
يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সরল অনুবাদ

"(হে মুসলমানরা) তোমরা রাসূলের ডাককে তোমাদের পারস্পরিক ডাকের মতো মনে করো না। আল্লাহ তায়ালা সেসব লোককে ভালো করেই জানেন, যারা নিজেদের আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজুহাতে নেফাকী বশত:) সরে যায়। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা উচিৎ, তাদের ওপর (এ দুনিয়ায়) কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে, কিংবা (পরকালে) কোনো কঠিন আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নেবে।" (সূরা আন-নূর : ৬৩)

আয়াতের আলোচ্য বিষয়

তিনটি বিষয়ে আলোচ্য আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহর রাসূল (সা.) কে সম্বোধনের শিষ্টাচার।

২. মহানবী (সা.) এর জামায়াতে মুনাফিকদের দূর্বল অংশগ্রহণ ও বিনা অনুমতিতে জামায়াত থেকে পলায়ন।

৩. মহানবী (সা.) এর নির্দেশ বা তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ না করার ভয়াবহ পরিণতি।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক

আল-কুরআনের ২৪ নং সূরা আন-নূরের এ আয়াতে মূলতঃ সূরার মৌলিক একটি বিষয়ের আলোচনার সমাপ্তির পথে। মৌলিক যে বিষয় ইতিপূর্বে কথা চলছিল, তা হলো মুমিন জীবনে অনুমতির বিধান। যে বিধানটির সাথে মানব সমাজের সামাজিক জীবনের অত্যাধিক গুরুত্ব রয়েছে। সরাসরি অত্র আয়াত মূলত: তার পূর্বের আয়াতের সাথে নাযিল হয়েছে। অর্থ, মর্ম ও প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণরূপে পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। আমরা আমাদের বিষয়ভিত্তিক দারস নিতে মূলত: আয়াতখানি চয়ন করেছি।

নাযিলের প্রেক্ষাপট

আয়াতগুলোর শানে নুযূল বা প্রেক্ষাপটে ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, আয়াতগুলো গাযওয়াতুল খান্দাক বা গাযওয়াতুল আহ্‌যাবের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। যাকে বাংলায় খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। যখন কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কাফিরগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তখন মহানবী (সা.) মদীনা মুনাওয়ারার চতুর্পাশে খন্দক বা গর্ত খনন করেছিলেন। এ কাজে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) অংশ নিয়েছেন। কষ্ট করে খনন কাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এমনকি নিজেও পাথর টেনেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর

সাথে জীবন উৎসর্গের মতো মেহনত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা এ কাজে যথেষ্ট গাফলতি করেছে। নিজেরা শুধু দূরে থাকা নয়, দূর্বল মুমিনদেরকেও সাথে নিয়ে কাজ থেকে মহানবীর (সা.) অনুমতি ছাড়া পলায়ন করেছে। মূলত: সাহাবাদের কারো কোন প্রয়োজনে এসব কাজে রাসূল (সা.) এর অনুমতি না নিয়ে কেউ জামায়াত থেকে দূরে যেতেন না। মুনাফিকদের এমন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

কঠিন কয়েকটি শব্দের বিশ্লেষণ

- আয়াতে دُعَآءِ শব্দের অর্থ ডাকা বা সম্বোধন করা। دُعَآءَ الرَّسُولِ অর্থ হবে রসূল (সা.) কে সম্বোধন।
- قَدْ শব্দটি আরবীতে সাধারণত: সম্ভাব্য অর্থ বুঝাতে ক্রিয়াপদের শুরুতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। قَدْ يَعْلَمُ এর অর্থ- আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত জানেন।
- يَتَسَلَّلُونَ অর্থ- তারা গোপনে, সুযোগ নিয়ে ও চুরি করে বের হয়।
- لِوَاذًا শব্দটি ملاوذة শব্দের সমার্থক। এর অর্থ- কারো ভয়ে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা, নিজেকে আড়াল করা। আয়াতে শব্দটি পূবের শব্দের অর্থকে জোরদার করেছে। মুনাফিকদের পলায়নের চিত্র তুলে ধরেছে।

তাফসীর বা ব্যাখ্যা

আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের (সা.) সর্বোচ্চ সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে সম্বোধনের শিষ্টাচার মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

অর্থাৎ, হে মুমিনেরা, তোমরা যেভাবে একে অপরকে সম্বোধন করো বা ডাকো, সেভাবে রাসূল (সঃ) কে ডাকবে না।" সরাসরি তাঁর নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং বলতে হবে ইয়া নাবিআল্লাহ- হে আল্লাহর নবী বা ইয়া রাসূলুল্লাহ- হে আল্লাহর রসূল। ইয়া মুহাম্মদ বা ইয়া আহমাদ বলে তাঁকে ডাকা উম্মাতের জন্য চরম অভদ্রতা।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে (সঃ) কুরআনের মাঝে কোথাও তাঁর নাম ধরে ডাক দেননি। যেটা অন্যান্য নবী-রসূলের বেলায় করেছেন। তাঁর পছন্দের সেরা ও শেষ নবীকে অন্যান্য গুণাবলী সমৃদ্ধ শব্দ দিয়ে ডেকেছেন। যেমন- হে মুদ্দাস্‌সির, হে মুয্‌যাম্মিল। অর্থাৎ হে বস্ত্র বা কম্বল আচ্ছাদনকারী। কখনও ইয়া আইউহান্নাবিয়্যু, হে সম্মানিত নবী বা কখনও ইয়া আইউহার রাসূলু, হে সম্মানিত রাসূল ইত্যাদি।

যদিও আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর (সঃ) নাম কুরআনে কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা সবই বর্ণনামূলক বাক্যে, কোথাও তাঁকে তাঁর নামে সম্বোধন করা হয়নি। অনুরূপভাবে নবীর (সঃ) সামনে জোর আওয়াজে কথা বলা সূরা হুজরাতের শুরুতে নিষেধ করা হয়েছে। গৃহের পেছন থেকে নাম ধরে তাঁকে যারা ডাকে, তাদেরকে ঐ সূরায় নির্বোধ বলা হয়েছে।

আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় যে বিষয় অত্যন্ত চমৎকার বাচন ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো মহানবীর (সঃ) দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর জামায়াত থেকে বের হয়ে যেত। আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এসব মুনাফিকদের এ জাতীয় দুশ্চরিত্র সম্পর্কে ভালো করেই খবর রাখেন। তারা রাসূলের (সঃ) কাছ থেকে তাঁর বিনা অনুমতিতে অতি গোপনে অল্প অল্প করে বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করে। এক পর্যায়ে তারা সবাই বের হয়ে যায়। মুফাস্‌সিরগণ বলেন, মুনাফিকরা এভাবে কখনও মহানবীর (সঃ) খুতবা চলাকালে, কখনও ইলমী আলোচনার মজলিস থেকে, কখনও জিহাদের জামায়াত থেকে বের হয়ে যেত। এসব ক্ষেত্রে তারা যে ওযরগুলো পেশ করত, সেগুলো ছিল অত্যন্ত দূর্বল ও ঠুনকো ওযর। সর্বোপরি, আয়াতে মুনাফিকদের চারিত্রিক নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য ও কাপুরুষতার কথা চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আয়াতের শেষাংশে মহানবীর (সঃ) নির্দেশ, তাঁর দিক নির্দেশনা, তাঁর সুন্নাহ প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দুনিয়ার বালা-মুসীবাত ও আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি যেহেতু আল্লাহ তায়ালার বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তাই তাঁর সুন্নাহ, তাঁর নির্দেশই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তাই যেসব মুনাফিক শ্রেণীর মানুষ তাঁর

অবাধ্য হবে, তাদের জন্য এমন ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্বের খ্যাতনামা মুফতীগণ মনে করেন, রসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ পালন করা ফরজ বিধান। যেহেতু তাঁর নির্দেশ অমান্য করার বিপরীতে শাস্তি আরোপের বিধান এসেছে। তাই, এখান থেকে ফকীহগণ ইসলামের একটি মূলনীতি বের করেছেন, তা হলো- আল্লাহর আদেশ না মানলে যেমন শাস্তি রয়েছে, তেমনি তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মানলেও শাস্তি রয়েছে; যেখানে শাস্তির কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করা হবে, সে বিধানকে অবশ্যই ফরয বিধানের মর্যাদা দিতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষা

- মহানবী (সঃ) এর নাম ধরে তাঁকে ডাকা চরম বেয়াদবী। বরং তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া ঈমানের দাবী।
- বর্তমান সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ মহানবী (সঃ) কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, এ আচরণের মধ্য দিয়ে তারা তাদের পরিচয় প্রকাশিত করে। তারা ঈমানদার থাকতে পারে না। এমন শ্রেণীর মানুষ মুনাফিক। যারা কাফিরদের চেয়েও জঘন্য। তাদের শাস্তিও সবচেয়ে কঠোর।
- কাপুরুষতা দেখিয়ে মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ ইস্যুতে যারা একাত্নতা পোষণ করে না, তারাও মুনাফিক।
- মহানবীর (সঃ) সুন্নাহকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে পালন করতে হবে। সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতে হবে। পালন না করতে পারলেও শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

শেষকথা

রাসূল (সঃ) কে আল্লাহ তায়ালা যে কয়টি গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো হিকমাত শিক্ষা দেয়া; অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে ঈমানদারদের প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তালীম দেয়া সেজন্য মুমিনদের উচিৎ নিয়মিত কুরআন অধ্যয়নের পাশাপাশি সুন্নাহ বা হাদীসেরও অধ্যয়ন ও চর্চা করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সুন্নাহ চর্চা ও সে অনুযায়ী জীবন গঠনের তাওফীক দিন। আমীন॥

RK DIGITAL
FUJI CTP PLATE
FLEX
ENCAD PVC FLEX
CTP
FUJI PLATE
নিখুঁত ডট ও সর্বোচ্চ ইমপ্রেশন এর নিশ্চয়তা
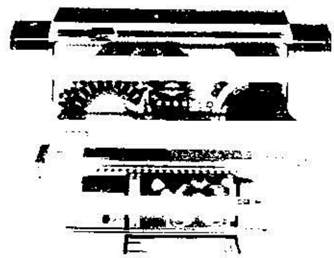

031-2865011 rkdigitalctg@gmail.com

NP
NEOGRAPH PRINTERS
An Exclusive 100% Export Oriented
Garments Accessories Supplier & Manufacturer

031 2868011
01712 881009
01830 002283
neograph2005@gmail.com

Non Elastic Band & Belt
Elastic, Drawsting,
Twill Tape
Hang Tag, Size Tag
Woven Label, Care Label
Textile Fabrics
Heat Seal Price Tag
Barcode Sticker
Back Bord
PVC, Flex, Sticker

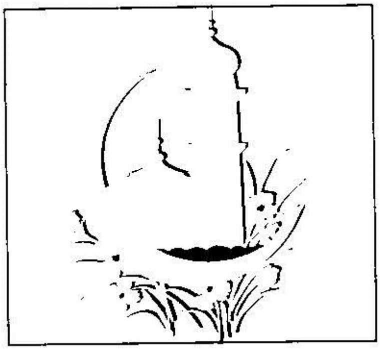

ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার পদ্ধতি

সাইয়্যেদ নূর আল আযহারী
খন্ডকালীন প্রভাষক
দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

عن طارق بن شهاب- وهذا حديث أبي بكر- قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

সরল অনুবাদ

তারিক ইবনু শিহাব (আবু বাকর ইবনু আবি শাইবার হাদিস) বর্ণনা করেছেন ঈদের দিন সালাতের পূর্বে খুত্‌বাহ দেয়ার প্রথা প্রথম প্রচলন করেন মারওয়ান ইবনুল হিকাম। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুত্‌বার আগে সালাত সম্পন্ন করুন। তখন মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) উঠে বললেন ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ গর্হিত বা মন্দ কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগ করে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার ক্ষমতা না থাকে তবে জিহ্বা (বক্তব্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে তখন অন্তর দ্বারা (ঘৃণা) করবে, তবে এটাই হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতম পরিচায়ক।[১]

হাদিসটির আলোচ্য বিষয়

মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী জাতি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। সমাজকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে পবিত্র করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেছেন। সমাজকে পবিত্র করার অন্যতম উপাদান হচ্ছে 'আমর বিল মারূফ' বা ভালো কাজের আদেশ করা এবং 'নাহী আনিল মুনকার' বা মন্দ কাজের নিষেধ করা। আলোচ্য হাদিসটিতে মুসলিম উম্মাহর এ পবিত্র দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হাদিসটির ব্যাখ্যা

ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয করেছেন। যেমন কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে-

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কর্মের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে, আর তারাই হলো সফলকাম।[২] অতএব 'আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার' এর দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ঐচ্ছিক বিষয় নয় বরং এটি ফরয বা আবশ্যিক। সাধ্যমতে তাদেরকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে তাহলে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি মানব কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[৩]

নামায আদায় করা বান্দাহর ওপর আল্লাহ তা'আলার হক্ব, যাকাত ধনীদের উপর গরীবের হক্ব আর ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা সামাজিক অধিকার। এটি মুমিনের অন্যতম গুণাবলী। কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে-

الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

'তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।[৪]

অন্যত্রে এরশাদ হয়েছে-

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله

'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে; নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।[৫]

ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি পূত পবিত্র নিরাপত্তা সম্বলিত সমাজ কায়েম করা, ইসলামের সৌন্দর্য সমূহ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়া এবং দুষ্ট চক্রের কবল থেকে সমাজকে হেফাজত করা।

সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎ কাজের বাধা দানকারীকে রাসূল (সা.) সর্বোত্তম ব্যক্তি বলেছেন-

عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم

'দুররা বিনতে আবি লাহাব বলেন, রাসূল (সা.) মিম্বারে বক্তব্য প্রদানের সময়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, সবচেয়ে বেশী কুরআন তিলাওয়াতকারী, তাক্বওয়ার অধিকারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজের বাধা দানকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি।[৬] অপরদিকে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করবে না তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির বিধান রয়েছে। হাদিসে এসেছে-

عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

'হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান বর্ণনা করেছেন নবী কারীম (সা.) বলেছেন সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের বাধা দিবে, না হয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতপরঃ তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।[৭] আরেক হাদিসে এসেছে-

عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا

'জারীর (রা.) বলেন আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকবে যেখানে পাপাচার চলছে, সে ব্যক্তি যদি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তন না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর মৃত্যুর পূর্বে আযাব প্রেরণ করবেন।[৮]

সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎ কাজের বাধা দানকারী সর্ব অবস্থায় কল্যাণ অর্জন করবে। যদি কোন দায়ী শিষ্টাচার মেনে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে; হয় তার দাওয়াতে সাড়া দেয়া হবে অথবা তার দাওয়াত বর্জন করা হবে। তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যদি পাপীরা পাপাচার ত্যাগ করে তাহলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান পুরস্কার লাভ করবেন। আর যদি তার দাওয়াত বর্জনও করা হয় তাহলে তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন বিধায় কোন প্রকার শাস্তির সম্মুখীন হবেন না। দায়ীদের দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া, হিদায়তের মালিক আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে-

وما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون

রাসূলের দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং গোপন করো।[৯]

হাদিসটির শিক্ষা

* সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজের বাধা দান ঐচ্ছিক বিষয় নয় বরং এটি সক্ষমতা অনুযায়ী ফরয।
* মুসলিম উম্মাহর স্থায়ীত্বের অন্যতম উপাদান সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা।
* হাদিসটি প্রমাণ করে ঈমানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে।
* শরীয়ত বাস্তবায়নে পারস্পারিক সহযোগিতা এবং ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক।
* মন্দ বা পাপকে সর্ব অবস্থায় ঘৃণা করা এবং পাপী বা অপরাধীকে শরীয়ত পালনে উদ্বুদ্ধ করা।
* প্রত্যেক মুসলিমের সমাজ বির্নিমাণে ভূমিকা রয়েছে। এমনকি দূর্বল ব্যক্তিও অন্তর দ্বারা পরিবর্তন বা ঘৃণা করার মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

এ হাদিসটিতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ফলপ্রসূ দাওয়াতী কাজের জন্য এ হাদিসে বাস্তব দিক নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার তাওফিক দান করুন। সকল কাজ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির লক্ষে করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

তথ্যসূত্র :

১. সহীহ মুসলিম ২১/২, আবু দাউদ ১২৩/৪, তিরমিযী ৪৬৯/৪
২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪
৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১০
৪. সূরা হাজ্জ, আয়াত-৪১
৫. সূরা তাওবা, আয়াত-৭১
৬. মুসনাদ আহমাদ, ৪৩৩/৬
৭. সুনান তিরমিযী, ৪৬৮/৪
৮. সুনান আবি দাউদ, ১২২/৪
৯. সূরা মায়েদা, আয়াত-৯৯

মুহাম্মদ (সা.) আমাদের আদর্শ

ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক
চেয়ারম্যান, দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি তাঁর সুমহান আদর্শ দিয়েই মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। আরবের লোকজন তাঁকে বিশ্বস্ত হিসেবেই পেয়েছিলেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য্যতা সবাইকে স্পর্শ করত। মানবকূলতো বটেই এমনকি প্রাণীকূল গাছপালাও তাঁকে ভালবাসত। এই ভালবাসা তিনি জোর করে আদায় করেননি। এই ভালবাসা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য দিয়ে।

আমরা এখন এমন একটা সময় পার করছি যখন আমাদের সবকিছু আছে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব খুব প্রকট আকার ধারন করেছে। সেই জিনিসটি হচ্ছে 'আদর্শ'। আমরা সংখ্যায় অনেক। আমরা জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিতেও কম আগাইনি। কিন্তু আদর্শের জায়গায় আমাদের অবস্থান জিরো বললেই চলে। এ কারণেই সারা বিশ্বে আমরা আজ কোণঠাসা। আমরা যদি বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে চাই তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি আদর্শিক দিয়ে আমাদের উন্নতি করতে হবে। আমাদের জন্য নবী সা. এর আদর্শই হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

অর্থাৎ- 'তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ' (সূরা- আল আহযাব ঃ ২১)।

আমাদের প্রিয় নবীর আদর্শকে যদি আমরা আমাদের জীবনের পরতে পরতে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমরা হব বিশ্বসেরা। আমরাই তখন গোটা বিশ্বকে পথ দেখাতে পারব।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه رداءٌ نجرانيٌّ غليظ الحاشية. فأدركه أعرابيٌّ، فجبذه جبذةً شديدةً، حتى انشق البُرد، وحتى بقيت حاشيتهُ في عنق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونظرت إلى صفحةِ عنقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أثرت بها حاشيةُ الرداء ثم قال: يا محمد، مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك، ثم أمر له بعطاء.

বিখ্যাত সাহাবি আনাস বিন মালেক (রা.) তাঁর চোখের সামনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল সা. এর সাথে হাটতে ছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল নাজরানি মোটা চাদর। এমন সময় এক বেদুঈন পেছন থেকে তাঁর চাদর ধরে সজোরে টান মারে। এতে চাদরটি ছিড়ে যায় এবং রাসূল সা. এর ঘাড়ে লাল দাগ হয়ে যায়। বেদুঈন লোকটি এহেন কাজ করে রাসূল সা. কে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ আমাকে বায়তুল মাল থেকে কিছু মাল দেওয়ার নির্দেশ দাও। তখন নবী সা. বেদুঈন লোকটির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন অত:পর তাঁকে কিছু মাল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন'।

প্রিয় পাঠক। একটু খেয়াল করুন। কতটা বিনয়ী মানুষ হলে এমন আচরণ করা যায়! যে বেদুঈন রাসুল সা.কে রাস্তায় লোকজনের সামনে দামী পোষাক ছিড়ে শরীরের রক্ত বের করে দিলেন; সে লোকটিকে বকা না দিয়ে বরং হাস্য বদনে বরণ করে নিয়ে টাকা পয়সা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন নবী সা.! কল্পনা করুনতো একবার। আমাদের কারো সাথে এমনটা ঘটলে আমরা কী করতাম? আমাদের সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদের সাথে কেউ এমন আচরণ করলে তিনি কী করতেন?

রাসূল কারীম সা. এই যে বিনয়ের নমুনা পেশ করলেন একেই বলে আদর্শ। একেই বলে সর্বোত্তম আদর্শ। যেই আদর্শকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

একবার নবী সা. এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য এক বেদুঈন আসলো। বেদুঈন লোকটি মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, মসজিদের এক কোণে কতিপয় লোক একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করছে। এই সময়ে তার পেশাবের বেগ আসলো। তখন সে মসজিদের ভেতরেই পেশাব করে দেয়। এতে সাহাবিরা সবাই

ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন এবং তেড়ে এসে লোকটি মারার জন্য উদ্যত হলেন। তখন নবী সা. তাঁদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন,

دعوه، وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء، أو ذَنوباً من ماءٍ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (صحيح البخاري)

অর্থাৎ- 'তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে আল্লাহ কোমল আচরণের জন্য পেরণ করেছেন: তোমাদেরকে মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি' (সহিহ বুখারী)।

আল্লাহর ঘর মসজিদকে যিনি নাপাক করলেন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানো স্বাবাভিক ঘটনা ছিল। সাহাবিদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিলো। কিন্তু তারপরও রাসূল সা. ঐ বেদুঈন লোকটিকে কিছু বলেননি। উল্টো তার পেশাব পরিস্কার করার জন্য নির্দেশ দিলেন প্রিয় নবী। মানুষের সাথে বিনয়ী হওয়ার জন্য এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর হতে পারে না।

عنْ مالِك بْن الْحُويْرث، قال: أتينا رسُول الله صلّى اللهُ عليْه وسلّم، ونحْنُ شببةٌ مُتقاربُون، فأقمْنا عنْدهُ عِشْرين ليْلةً، قال: وكان رسُولُ الله صلّى اللهُ عليْه وسلّم رحيمًا رفيقًا

মালেক বিন আল হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক রাসূল সা. এর কাছে এসে বিশ রাত্রি থাকলাম। অথচ নবী সা. একটুও বিরক্ত হলেন না বরং তিনি আমাদের সাথে বন্ধুবৎসল ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

কোনো ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়া একটানা বিশ দিন যুবকদের মেহমানদারী করার ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের প্রিয় নবী সা. কতটা প্রশস্ত হৃদয়ের ও উদার ছিলেন।

শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রিয় নবী সা. ছিলেন মহান আদর্শের প্রতীক। তিনি হেকমতের সাথে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতেন। অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, মন-মানসিকতা সবকিছু বাছ বিচার করতেন।

عنْ مُعاوِيةَ بْنِ الْحكمِ السُّلمِيِّ، قال: بيْنما أنا أُصلِّي مع النّبِيِّ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم إذْ عطس رجُلٌ مِن الْقوْمِ فقُلْتُ: يرْحمُك اللهُ، فرماني الْقوْمُ بِأبْصارِهِمْ، فقُلْتُ: واثُكْل أُمّاهْ، ما شأْنُكُمْ تنْظُرُون إِليّ؟ فجعلُوا يضْرِبُون بِأيْدِيهِمْ على أفْخاذِهِمْ فلمّا رأيْتُهُمْ يُصمِّتُونِي سكتُّ، فلمّا صلّى رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم، فبِأبِي هُو وأُمِّي، ما رأيْتُ مُعلِّمًا قبْلهُ ولا بعْدهُ أحْسن تعْلِيمًا مِنْهُ، واللهِ ما كهرنِي ولا ضربنِي، ولا شتمنِي، قال: «إِنّ هذِهِ الصّلاة لا يصْلُحُ فِيها شيْءٌ مِنْ كلامِ النّاسِ، إِنّما هِي التّسْبِيحُ والتّكْبِيرُ والتّهْلِيلُ وقِراءةُ الْقُرْآنِ»

মুয়াবিয়া বিন আল হাকাম আস সুলামি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সা. এর সাথে নামাজ পড়তে ছিলাম। এমন অবস্থায় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি তখন হাঁচির দোয়া 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললাম। লোকজন আমার এই কর্ম দেখে চোখে টিপ্পনি কাটতে শুরু করলে আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের কী হলো যে আমার দিকে তাকিয়ে অমন করছ? আমার এ কথা শুনে তারা সবাই উরুতে হাত চাপরিয়ে অট্টহাসি দিল। আমি যখন দেখলাম, তারা আমাকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে আমি তখন চুপ হয়ে গেলাম। এরপর নবী সা. এর নামাজ শেষ হলো। আমি রাসূলের মত এত চমৎকার শিক্ষক কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে একটু ধমক, মারপিট কিংবা বকাঝকা করেননি। তিনি বললেন: "আমাদের নামাজে লোকজনের কথা বলা ঠিক নয়। আমাদের নামাজে শুধু তাসবিহ, তাকবির ও সুরা পাঠ করা যায়" (মুসলিম)।

عنْ أبِي أُمامة قال: إِنّ فتًى شابًا أتى النّبِيّ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم فقال: يا رسُول اللهِ، ائْذنْ لِي بِالزِّنا، فأقْبل الْقوْمُ عليْهِ فزجرُوهُ وقالُوا: مهْ. مهْ. فقال: " ادْنُهْ، فدنا مِنْهُ قرِيبًا ". قال: فجلس قال: " أتُحِبُّهُ لِأُمِّك؟ " قال: لا. واللهِ جعلنِي اللهُ فِداءك. قال: " ولا النّاسُ يُحِبُّونهُ لِأُمّهاتِهِمْ ". قال: " أفتُحِبُّهُ لِابْنتِك؟ " قال: لا. واللهِ يا

رَسُولَ اللهِ جعلني اللهُ فداءكَ قال: " ولا النّاسُ يُحبُّونَهُ لبناتِهِمْ ". قال: " أفتحبُّهُ لأُختِكَ؟ " قال: لا. واللهِ جَعَلني اللهُ فداءكَ. قال: " وَلا النّاسُ يُحبُّونَهُ لأخَواتِهِمْ ". قال: " أفتحبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ " قالَ: لا. واللهِ جعلني اللهُ فداءكَ. قال: " وَلا النّاسُ يُحبُّونَهُ لِعَمّاتِهِمْ ". قال: " أفَتُحِبُّهُ لخالتِكَ؟ " قال: لا. واللهِ جَعَلني اللهُ فداءكَ. قَالَ: " ولا النّاسُ يُحبُّونَهُ لخالاتِهِمْ ". قال: فوضع يدَهُ عَلَيْهِ وَقال: " اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وحَصِّنْ فَرْجَهُ " قال (2) : فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفتى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে এক কুরাইশ যুবক ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা করে। প্রিয় নবীর সামনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রেগে ওঠে সে যুবককে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তিনি শান্তচিত্তে যুবকটিকে তাঁর একেবারে কাছে আসতে বললেন। অতঃপর কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন-

- তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা (ব্যভিচার) মেনে নেবে?

যুবক জবাব দিল, 'না'।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '(অন্য) লোকেরাও এটা তাদের জন্য অনুমোদন করবে না।'

- অতঃপর তিনি আবার যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন এটা (ব্যভিচার) সে তার কন্যা, বোন ও চাচির জন্য অনুমোদন করবে কিনা?

এবারও যুবক জবাব দিল, 'না'।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারো বললেন, '(অন্য) লোকরাও এটা তাদের জন্য অনুমোদন করবে না।'

- অতঃপর তিনি (প্রিয়নবি) যুবকটির হাত ধরে বললেন, 'আল্লাহ্ তার (যুবকের) পাপ মাফ করে দিন, তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তাকে সহিষ্ণু করুন (তার এই কামনার বিরুদ্ধে)।' এরপর থেকে ঐ যুবককে আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে দেখা যায়নি (মুসনাদে আহমদ, তাবরানি)।

দেখুন নবী সা. কত সহিষ্ণু ছিলেন! তিনি কত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন! তিনি প্রজ্ঞার সাথে যুবকটির মনোজগতে প্রবেশ করে এমনভাবে তাঁর চেতনাকে নাড়া দিলেন যে, যুবকটি যেনা-ব্যভিচারের চিন্তা একেবারেই বাদ দিলেন। রাসূল সা. এর এই যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এটাই আমাদের জন্য বড় আদর্শ। পৃথিবীর সকল মা-বাবা, শিক্ষকবৃন্দ নবীজীর এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে প্রজ্ঞার সাথে আমাদের বখে যাওয়া যুবক/যুবতীদেরকে অন্ধকার জগত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

আমাদের প্রিয় নবী সা. সেরা বিনয়ী ছিলেন। তিনি যখন ছোট শিশুদের দেখতেন সাথে সাথে তাদেরকে সালাম দিতেন। তিনি তাঁদের খেলার সাথী হয়ে যেতেন। ছোট্ট বালিকারা রাসূলের হাত ধরে যেথায় ইচ্ছা সেথায় টেনে নিয়ে যেত। নবী সা. নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন। তিনি ছেড়া জামা কাপড় সেলাই করতেন। বাড়ীর বকরীগুলোর দুধ দহন করতেন। ঘরে স্ত্রীদের কাজে সহায়তা করতেন। তিনি গরীব মিসকিনদের সাথে উঠা-বসা করতেন। ইয়াতীম মিসকিনদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছুটে যেতেন। অতি সাধারণ মানুষের দাওয়াতেও তিনি সাড়া দিতেন। আশে পাশের কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন আমাদের প্রিয় নবী সা.। কেউ মারা গেলে তার জানাজা নামাজে শরিক হতেন তিনি। গাধার পিঠে সওয়ার হতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

আমাদের প্রিয় নবী সা. বীরত্বেও ছিলেন আদর্শের প্রতীক। তিনি বাতিলের সামনে কখনো মাথা নত করেননি। কোনো অসৎ কাজ তার সামনে সংঘটিত হতে পারত না। তিনি যখন রেগে অগ্নিশর্মা হতেন তাঁর ধারে কাছে যেতেও সাহাবারা ভয় পেতেন।

عن البراء بن عازب قال: كنا والله إذا احمر البأسُ نتقي به، وإن الشجاعَ منا للذي يحاذي به- يعني النبي - صلى الله عليه وسلم.

নবী সা. অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। দান করার ক্ষেত্রে এত উদার ছিলেন যে, তাঁর দানের সাথে বাতাসের গতিবেগের তুলনা করা হতো। তিনি দান করার সময় দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করতেন না।

عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة.

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মাঝে যত বকরী আছে সেগুলো দান করে দিলেন। অত:পর লোকটি তার গোত্রের কাছে গিয়ে বললো: হে আমার কওমের লোকেরা! আমার কথা শোন, মুহাম্মদ এত বেশী দান করেন কিন্তু তিনি দরিদ্রতার পরোয়া করেন না।

নবী সা. খুব বেশী মোত্তাকী ছিলেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে অঝোরে কান্না করতেন। দিন-রাত শতাধিকবার তাওবা ইস্তেগফার করতেন। তিনি বেগুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

"توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة"

নবী সা. বলেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তেগফার কর। আমি দিনের মধ্যে একশ বার তাওবা করি" (মুসলিম)।

আমরা আমাদের অধীনস্থ পিয়ন, কাজের লোকদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করি। পান থেকে চুন খসে পড়লেই তাদেরকে ধমক দেই। অনেকেতো সরাসরি প্রহারও করেন। কাজের মহিলারা নিগৃহীত হওয়ার খবর আমরা হর হামেশা পাই। তাদেরকে রক্তাক্ত করা হয়, আগুনে ছ্যাকা দেয়া হয়, যৌন নির্যাতন করা হয়।

নবী সা. কাজের লোকদের সাথে এমন আচরণ করেননি। তিনি তাদের সাথে যে আচরণ করতেন তা এক কথায় আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর অধীনস্থ কেউ কখনো নবীজীর ভ্রু কুঁচকানি পর্যন্ত দেখেননি। নবী সা. এর চেহারায় বিরক্তির ছাপও দেখা যায়নি কখনো।

হযরত আনাস বিন মালেক রা. রাসূল সা. এর খাদেম ছিলেন। প্রথম দিনেই আল্লাহর রাসূল সা. তাঁকে চমকে দিলেন। আনাসের মা যখন রাসূল সা. এর সামনে আনাসকে নিয়ে আসলেন তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাল্লাহ! এ হচ্ছে আনাস, আপনার খাদেম: আপনি ওর জন্য একটু দোয়া করুন। নবী সা. আনাসকে কাছে নিয়ে কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিলেন। এরপর দোয়া করলেন:

اللهم أكثِرْ مالَه، وولدَه، وبارِكْ له فيما أعطَيْتَه

"হে আল্লাহ আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি বাড়িয়ে দাও এবং তাঁকে যা (রিযিক) দান করেছ তার মধ্যে বরকত দিয়ে দিন" (বুখারী)।

কতটা প্রশস্ত হৃদয় আর স্নেহপরায়ণ হলে একজন ব্যক্তি তার খাদেমকে প্রথম সাক্ষাতে চুম্বন করে তার জন্য আল্লাহর কাছে এমন দোয়া করতে পারেন! এ ধরনের নজির গোটা পৃথিবীতে কেউ স্থাপন করতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই।

আনাস রা. রাসূল সা. এর কাছে একটানা দশ বছর ছিলেন। রাসূল সা. কে তিনি কাছ থেকে খেদমত করেছিলেন। আনাস রা. এর মুখ থেকেই শোনা যাক রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে। আনাস রা. রাসূলের সাথে দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء كرهه لمَ فعلته، ولا لامني نساؤه إلا قال لهن: دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر، وما قال لشيء صنعته لمَ صنعته؟ ولا لشيء تركته لمَ تركته؟

"আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূল সা. কোন কাজ অপছন্দ করলেও কখনো আমাকে বলেননি যে, তুমি এটা কেন করেছ? তাঁর স্ত্রীগণও কখনো আমাকে কোনো কাজের জন্য বকা দেয়নি। রাসূল সা. তাঁর স্ত্রীদেরকে বলতেন, তোমরা তার দোষ খোঁজ না: আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। কখনো তিনি বলেননি, কেন এটা করলে না বা করেছ। কোনো কাজ না করে থাকলে বলেননি যে, কেন তুমি এ কাজটি বাদ রেখেছ?।"

এক সাহাবী আল্লাহর রাসূল সা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দিনে কতবার আমাদের খাদেমদের ক্ষমা করে দেব? নবী সা. বললেন:

"তোমরা দিনে সত্তুর বারের অধিক তোমাদের খাদেমদের ক্ষমা করে দেবে"।

সত্যিই দুনিয়ায় এমন আদর্শ বিরল। আমরা যদি প্রিয় নবীর এই আদর্শকে গ্রহণ করতে পারি তাহলে কখনো বাসা বাড়ি কিংবা অফিস আদালতে কোনো কাজের লোক নির্যাতিত হওয়ার খবর পাওয়া যাবে না।

নবী সা. ছিলেন বেগুনাহগার বান্দা। তাঁকে কোনদিন কোন পাপ স্পর্শ করেনি। কিন্তু তারপরও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন। মিতরাফ রা. বলেন: "আমি রাসূল সা. কে নামাজের মধ্যে গুনগুনিয়ে কাঁদতে দেখেছি"।

নবী সা. ছিলেন দুনিয়া বিমূখ এক নির্লোভি ব্যক্তিত্ব। কোন টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, বেশ-ভূষা, রাজত্ব তাঁকে কখনো আকর্ষণ করেনি। উমর রা. একবার রাসূল সা. ঘরে ঢুকলেন। তিনি দেখলেন, রাসূল সা. মাদুরের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর দেহ আর মাদুরের মাঝে কোনো কিছু নেই। এতে মাদুরের দাগ তাঁর শরীরে বসে গেছে। আমি এ অবস্থা দেখে কেঁদে দিলাম আর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোম পারস্যের রাজ প্রাসাদে কত কিছুই না আছে! আর আপনি এই অবস্থায় আছেন অথচ আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল! তখন নবী সা. বললেন, তুমি কি চাও না যে, ওরা দুনিয়ার প্রাচুর্য্য উপভোগ করুক আর আমরা আখিরাতের প্রাচুর্য্য উপভোগ করি?

নবী সা. ইসলাম বিরোধীদের সাথেও খারাপ আচরণ করতেন না। 'যে ধর্মের হোক না কেন সে তো মানুষ' এই চেতনা লালন করতেন তিনি। তিনি ইহুদিদের সাথে কারবার করেছেন। তাদের কাছে স্বর্ণ বন্দক রেখেছেন। অথচ ইহুদিরা ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। একবার আল্লাহর রাসূলের সামনে দিয়ে এক ইহুদির লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাসূল (সা.) বসা অবস্থা থেকে দাড়িয়ে গেলেন! সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এতো ইহুদির লাশ! আপনি দাড়ালেন কেন? নবী সা. বললেন, সে কি মানুষ নয়?

নবী সা. এর চারিত্রিক মাধূর্যতা ও আদর্শের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। মানব জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তিনি আদর্শের নমুনা পেশ করে গেছেন। তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী। ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। আদর্শ বাবা, প্রতিবেশী, মুরব্বি, রাষ্ট্র নায়ক, নেতা, আবেদ, দাঈ ইলাল্লাহ ও সেবক। সমাজের প্রতিটি শ্রেণী পেশার মানুষ তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আমরা যদি আল্লাহর রাসূলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের সমাজও সোনার সমাজে পরিণত হবে যেমনটি হয়েছিল রাসূলের যুগে।

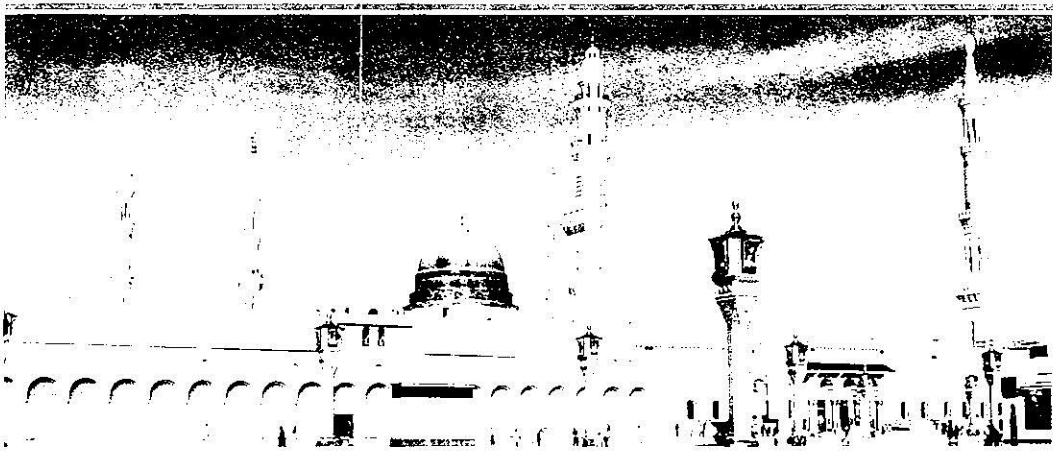

ঈদে মিলাদুন্নবী

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাফী উদ্দীন মাদানী
ডীন, শরীয়াহ্ অনুষদ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

ঈদ আরবী শব্দ। যার অর্থ ফিরে আসা। এমন দিনকে ঈদ বলা হয় যেদিন মানুষ একত্রিত হয় ও দিনটি বারবার ফিরে আসে। এ শব্দ দ্বারা এ দিবসের নাম রাখার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তাআলা এ দিবসে তার বান্দাদেরকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা বারবার ধন্য করেন এবং বারবার ইহসানের দৃষ্টি দান করেন। যেমন রমযানে পানাহার নিষিদ্ধ করার পর আবার পানাহারের আদেশ প্রদান করেন। সাদাকাতুল ফিতর, হজ্ব-যিয়ারত কুরবানীর গোশত ইত্যাদি নিয়ামত আল্লাহ বারবার ফিরিয়ে দেন। আর এ সকল নিয়ামত ফিরে পাবার আনন্দ উপভোগ করার জন্য মানুষ উৎসব করে থাকে। তাই এ দিনকে ঈদ বলা হয়।

ইসলামে ঈদের প্রচলন

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিশেষ রহমত স্বরূপ ঈদ দান করেছেন। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, "আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন মদিনাবাসীদের দুটো দিবস ছিল, যে দিবসদ্বয়ে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদীনাবাসীরা উত্তর দিল, আমরা জাহেলী যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা এ দুদিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১১৩৪)

শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফূর্তির জন্য ছিল যে দু'টো দিন, আল্লাহ তাআলা তা পরিবর্তন করে এমন দুটো দিন দান করলেন যে দিনে আল্লাহর শুকরিয়া তার যিকির, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে মার্জিতভাবে আমোদ-ফূর্তি, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া করা যায়। ইবনে জারীর (রা.) এর বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় হিজরীতে সর্বপ্রথম ঈদ পালন করেন।

মিলাদ এর সংজ্ঞা

'মিলাদ' আরবী শব্দ। যার অর্থ জন্মের সময়কাল। একে আরবীতে 'মাওলিদ'ও বলা হয়। 'মিলাদুন্নবী' অর্থ হলো নবীর জন্মের সময়কাল বা জন্মের মূহুর্ত। নবীর জন্মের বিবরণ, এ সংক্রান্ত কিছু কাহিনী ফারসী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় অবতারনা এবং মজলিসে উপস্থিত সকলে উপস্থাপকের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করা। আবার অনেক ফেরকার লোকেরা নবীর রুহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলা। সবশেষে পরিচালনাকারীর হাদিয়া গ্রহণ ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তবারক বিতরনের মাধ্যমে মিলাদ মাহফিল শেষ হয়।

মিলাদুন্নবীর উৎপত্তি

ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাইদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) ৬০৪ হিঃ

মতান্তরে ৬২৫ হিঃ সালে সর্বপ্রথম মিলাদের প্রচলন ঘটান।

উল্লেখ্য যে, কুকুবুরী ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর ছিলেন। গভর্ণর নিজে তাতে অংশগ্রহণ করতেন। আর এ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্ব প্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়া (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ) নামক এক দরবারী আলেম। তিনি সর্বপ্রথম মিলাদের বৈধতার সমর্থনে বহু সংখ্যক জাল ও বানোয়াট হাদীস জমা করেন।

কিয়াম প্রথার উৎপত্তি

মিলাদুন্নবীর উৎপত্তির প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক কিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে। (আবু সাঈদ মোহাম্মদ, মিলাদ মাহফিল, ঢাকা ১৯৬৬ খৃঃ, পৃঃ ১৭) তবে এর সঠিক তারিখ ও প্রবর্তকের নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায়না।

মিলাদুন্নবীর শরঈ বিধান

১. ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। যা পূর্ণতা লাভ করেছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায়। দ্বীনের এমন কোন দিক তিনি অপূর্ণ রেখে যাননি যা তার পরবর্তী কেউ পূর্ণতা দিবে। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতও পুরো করে দিলাম, তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম।" (আল মায়িদা : ৩)

   আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরও এমন ধৃষ্টতা কার রয়েছে যে দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু সংযোজন করবে?

২. এহেন ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী বিদআতীর ব্যাপারে বিশ্বনবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই সে প্রত্যাখ্যাত।" (মুত্তাফাকুল আলাইহি, মিশকাত, হাদিস নং ১৪০)

৩. বিদআত সম্পর্কে বিশ্বনবী (সঃ) আরো বলেন, "দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করা থেকে তোমরা সাবধান থাক। নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।" (আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৭, নাসাঈ, হাদিস নং ১৫৭৯, মিশকাত, হাদিস নং ৯১৬)

৪. ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর শিষ্য ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবার (রঃ) যুগে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, তা বর্তমানকালেও 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি দ্বীনের নামে ইসলামে নতুন কিছু চালু করল অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদআতে হাসানা' বলে আখ্যায়িত করল, সে ধারণা করে নিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) (আল-ইনসাফ, পৃঃ ৩২)

মিলাদ সম্পর্কে ইমামগণের মত

মিলাদ বিদআত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। 'আল-কাওলুল মু'তামাদ' শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে মত দিয়েছেন যে, মিলাদ বিদআত। তাঁরা বলেন, এরবল এলাকার গভর্ণর কুকুবুরী এ বিদআতের প্রবর্তক। তিনি যুগের আলেমদেরকে মিলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস বানানোর ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াম করার ফরমান জারী করেছিলেন।

মিলাদ সম্পর্কে উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামের মত

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, শায়খ আহমদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধি, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, আহমদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলে হাদীসের আলেমগণ প্রচলিত মিলাদ বিদআত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

মিলাদের ধরন

বাংলাদেশে প্রচলিত মিলাদকে পদ্ধতিগত দিক থেকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. কিয়াম বিহীন মিলাদ : যে মিলাদের আনুষ্ঠানিকতা বসা অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়।

২. কিয়াম যুক্ত মিলাদ : মিলাদের আনুষ্ঠানিকতার এক পর্যায়ে সকলে দাঁড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সম্মানে এটা করেন। বেরলভী ও ভান্ডারী সহ প্রমুখ উগ্রবাদীদের ধারণা হলো 'মিলাদ মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) রূহানীভাবে এমনকি কেউ বলে থাকেন স্বশরীরে হাযির হন। তাই কখনো এমনটাও দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বসার জন্য একটি শূন্য চেয়ারও রাখা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাযির হওয়ার এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতওয়ায়ে বাযযাবিয়াতে উল্লেখ আছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয় সে ব্যক্তি কুফরী করল।' (মিলাদে মুহাম্মদী, পুঃ ২৫-২৯)

অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'যারা ধারণা করে যে, মিলাদের মজলিসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রূহ মুবারক হাযির হয় তাদের এ ধারণা স্পষ্ট শিরক। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।' (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত, হাদীস নং ৪৬৯৯)

ঈদে মিলাদুন্নবী

মাহে রবিউল আওয়াল আসলে নানা ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মদিনকে স্মরণ করা হয়। মসজিদ, কবরস্থান, মাজারসহ রাস্তাঘাট আলোক সজ্জা করা হয় চাঁদ-তারা খচিত সবুজ পতাকা দিয়ে। মহল্লায় মহল্লায় গরু জবাই করা হয়। বাড়ী ঘরে গিয়ে চাঁদা আদায় করা হয়। নামাজ-রোজা ও দ্বীনদারী নেই এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় এ জাতীয় অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে খুব সক্রিয়। কারণ চাঁদার একটা বড় অংশ এরা (নিজেদের মধ্যে) ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। কেউ চাঁদা দিতে না চাইলে তর মহল্লায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে যায়। এ জাতীয় অবস্থা চট্টগ্রামের বিরিলভী প্রভাবিত এলাকাগুলোতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য যে, ১২ রবিউল আওয়াল বা তাদের সুবিধামত কোন এক তারিখে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। গরু জবাই করে বিরিয়ানী রান্না করে ঘরে ঘরে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও কোথাও এ উপলক্ষে মিলাদ বা আলোচনা মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়। আবার কোথাও শুধু খাবারের ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী

বেরলভী, ভান্ডারী, দেওয়ানবাগী ও সুরশ্বরীসহ কতিপয় গোষ্ঠী রবিউল আউয়ালে "জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী" শীর্ষক অনুষ্ঠান পালন করে। অর্থাৎ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মদিন উপলক্ষে ১২ রবিউল আউয়ালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয় এ উপলক্ষে সর্ববৃহৎ র‍্যালী। এ র‍্যালীর নেতৃত্ব দেন পাকিস্তান থেকে আগত জনৈক তথাকথিত আওলাদে রাসুল। মিলাদুন্নবীর ঈদকে বলা হয় সায়্যিদুল আয়াদ শরীফ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ। এ র‍্যালীতে যিনি নেতৃত্ব দেন তার জন্য ট্রাকে সুশোভিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। গোটা চট্টগ্রাম শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলো লাইটিং করা হয়। তোরণ নির্মাণ করা হয়। নানা শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন রাস্তাঘাটে টাঙ্গানো হয়। উর্দু, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নাত ও প্রশংসা সুস্পষ্ট শিরকী কাসিদা শের ও গজল পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন ট্রাকে করে সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে বাদ্যযন্ত্রসহ ব্যান্ড পার্টির মত যুবকেরা নাচানাচি ও লাফালাফি করতে থাকে। খৃষ্টানদের বড় দিনের চেয়েও আরো ঝাঁকজমকপূর্ণভাবে এর আয়োজন করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ উৎসব দূর্গাপূঁজার দেবী বিসর্জনের মতোই বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে জশনে জুলুসের র‍্যালী নানা সড়ক প্রদক্ষিণ করে থাকে। র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে পরিবেশন করা হয় ঠান্ডা পানীয় সহ নানা খাদ্যদ্রব্য। জশনে জুলুসের অনুষ্ঠানের বহুবিদ ফযীলত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, জশনে জুলুসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে হাসিল করা যাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শাফাআত ও জান্নাত আর মুক্তি লাভ করা যাবে জাহান্নাম থেকে।

মিলাদুন্নবী (সঃ) এর সমর্থনে দলীল সমূহ

ক. ঈদে মিলাদুন্নবীর বৈধতায় তারা কুরআনুল কারীমের নিম্নবর্ণিত আয়াত দুটো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে।

১. ঈসা ইবন মরিয়াম বললেন, হে আল্লাহ আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি

খাঞ্চা পাঠান। এটা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সবার জন্য 'ঈদ' বা আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। (আল-মায়িদা : ১১৪)

তাদের বক্তব্য হলো একটি খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রাপ্তির কারণে যদি এ দিনটি ঈদ বা আনন্দোৎসবের হতে পারে তাহলে রহমাতুল্লিল আলামীনের আগমণের দিনটি শুধু ঈদের নয় সায়্যিদুল আয়াদ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হওয়াই বাঞ্চনীয়।

২. বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায়, কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়। (ইউনুস-৫৯)

তাদের বক্তব্য হলো আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত ও অনুগ্রহ হলো বিশ্বনবীর আগমন বা জন্মলাভ। আর আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশের কথা বলেছেন। প্রকৃত আনন্দ হলো ঈদের আনন্দ। তাই রাসূলুল্লাহর জন্ম দিনটি আমাদের জন্য ঈদের দিন।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা যার ওপর নাযিল হয়েছে তিনি তো তার জন্ম দিনকে ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা দেননি এবং কোন ঈদ আনন্দ করেননি এবং উম্মাহকে এ দিবস উদযাপনের ঘোষণা বা অনুমতি প্রদানও করেন নি। এ আয়াতদ্বয়ের সর্বপ্রথম সম্বোধক সাহাবী জামাআত, পরবর্তীতে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের কেউ আয়াত থেকে ঈদ উৎসব পালন বা মিলাদুন্নবী উদযাপনের কথা বুঝলেন নি; দীর্ঘ ১৪ শত বছর পরে এসে এরা কুরআনের এ আয়াত দুটো থেকে ঈদ বা মিলাদুন্নবী উদযাপনের বিষয়টি বুঝল। তাদের এ বুঝ বা যুক্তিনির্ভর উক্তি ভ্রান্তি ছাড়া আর কী হতে পারে? এ জাতীয় তাফসীর বির-রায় তথা বুদ্ধিনির্ভর তাফসীর মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত মতে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

খ. মিলাদ অনুষ্ঠানের পক্ষে বানোয়াট হাদিস ও গল্প সমূহ

১. 'হে মুহাম্মদ! আপনি না হলে আসমান-যমীনে কিছুই সৃষ্টি করতামনা।' (দায়লামী, সিলসিলা যইফা, হাদিস নং ২৮২)

২. 'আমি আল্লাহর নূর হতে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হতে।'

৩. নূরে মুহাম্মদী হতেই আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম আসমান-জমিন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

৪. আদম (আ.) সৃষ্টির সত্তর হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁর নূর হতে মুহাম্মদ (সা.) এর নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মুআল্লায় লটকিয়ে রাখেন।

৫. আদম (আ.) সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মদ (সা.) এর নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

৬. মেরাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতাসহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। (নাউজুবিল্লাহ)

৭. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মের খবরে খুশি হয়ে আঙ্গুল উঁচু করা ও সংবাদ প্রদানকারীনি দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি আঙ্গুল আগুনে পুড়বেনা। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসুলের জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকুফ হবে। এমন একটি স্বপ্নের কথা প্রচলিত আছে আব্বাস (রা.) এর নামে। যা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের বর্ণনা।

৮. রাসূলুল্লাহ (সা.) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হতে মরিয়ম, আছিয়া, হাজেরা সহ একদল মহিলা আমেনার ঘরে এসে ধাত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

৯. নবীর জন্মের মূহুর্তে কাবার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ইত্যাদি...

উল্লেখিত বিষয়গুলো দূর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। (দেখুন: মওজুআতে কাবীর প্রভৃতি)

মিলাদুন্নবীতে বানোয়াট হাদীস নির্ভর ঘটনার অবতারনা ছাড়াও রাসূলুল্লাহর প্রশংসায় অতিরঞ্জন মূলক কাসিদা পাঠ হয়ে থাকে।

বানোয়াট ও জাল হাদিসের পরিণতি সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদিস রটনা করে সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করে নেয়।

বিশ্বনবী (সা.) তাঁর প্রশংসায় সীমালংঘন করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন "আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করোনা, যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে খৃষ্টানরা ঈসা (আ.) কে নিয়ে। আমি তাঁর একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা (আমার ব্যাপারে) বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" (বুখারী, হাদিস নং-৩৪৪৫)

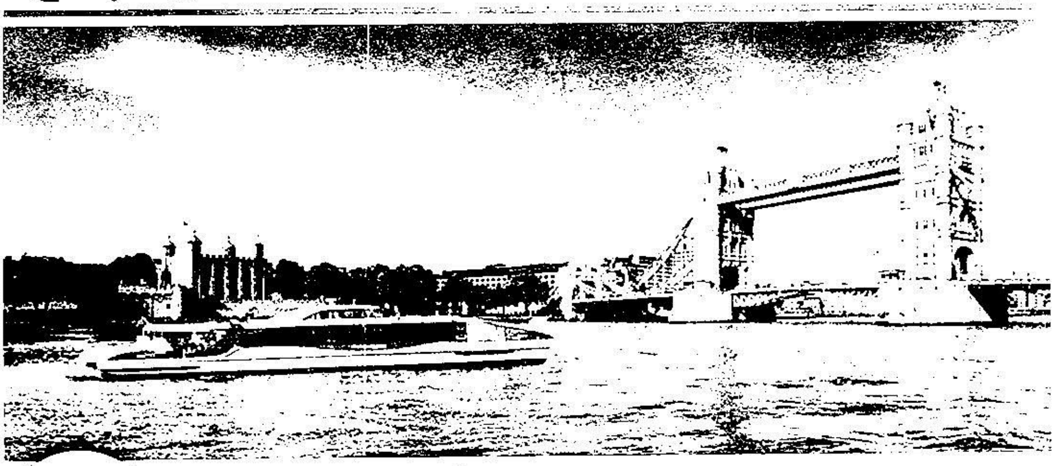

টেমস নদীর মোহনায় মুহাম্মদ (সা.)

শায়খ মাহমুদুল হাসান
◆ পরিচালক, টিভি ওয়ান, যুক্তরাজ্য; ◆ প্রিন্সিপ্যাল, ইসলামী অ্যাকাডেমী, অ্যাসেক্স জামে মসজিদ ট্রাস্ট, লন্ডন;
◆ প্রাক্তন শিক্ষক, আইআইইউসি ও চবি।

২০০৫ সনের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের শীত কনকনে একটি দিনে আমি 'সি টু সি' ট্রেন থেকে যখন প্রথম এ শহরে পা রাখি, শহরের নিস্তব্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, নদী ঘেঁষে এগিয়ে চলা সবকিছু আমাকে কেমন যেন চম্বুকাকর্ষণ করেছিল। বিমোহিত করেছিল শহরে পৌঁছার পূর্বেই। কয়েক স্টেশন আগে থেকে ট্রেন ছুটছিল টেমস নদীর মোহনার সাথে সাথে। এক দিকে ছিল সবুজ শ্যামল টিলা, ক্ষেত খামার আর অন্য দিকে নদী ও সমুদ্রের মিলনের উত্তেজনা। আমি তখন তন্ময় হয়ে উপভোগ করেছি এ অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কখন যে 'সাউথেন্ড' এসে পৌঁছে গেলাম বুঝতে পারিনি। শহরের সাইনবোর্ড দেখে বুঝলাম আমি গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি। পুরো নাম 'Southend-On-Sea'। আমার প্রবাস জীবনের এক যুগ পার হয়ে গেল এ শহরে। আমার তিন সন্তানের জন্মস্থান হয়ে গেল সেন্ট্রাল লন্ডন হতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত টেমস বিধৌত এ শহর। এখানের বীচ-সৈকত, বালু কণা, সাজানো উপত্যকা ও পৃথিবীর দীর্ঘ পিয়ার সবকিছুর সাথে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ এক বন্ধুত্ব। শহরের মেয়র, কাউন্সিলর, এমপি, পুলিশ প্রশাসন সবার সাথে তৈরী হয়েছে চমৎকার যোগাযোগ। কুকুর হাতে চলা বৃদ্ধ প্রতিবেশীও পথে দেখা হলে দাঁড়িয়ে যায় এবং হাত বাড়িয়ে দেয় আর হৃদয়ের উষ্ণতায় বলে 'গুড মর্ণিং'। একবার আমাদের প্রতিষ্ঠানে বর্ণবাদী হামলা হয়েছে শুনে কয়েকজন কাউন্সিলর, সাংবাদিক ও সমাজসেবী মানুষ চলে এসেছিলেন বাসায়। বয়স্ক মেয়র সাহেবের হাতে ছিল শান্তনার প্রতীক 'ফুলের টপ'। সম্প্রীতি ও শান্তির এ শহর ছেড়ে যাবো যাবো করেও যেতে পারিনি। মায়ার টান মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, বেঁধে রেখেছে নিবিড়ভাবে।

একদিন পোস্টবক্স খুলে চক্ষু চড়কগাছ। ছোট্ট খোকার নামে একটি প্যাকেট এসেছে পোস্টে। ভেতরে একটি বই, সাথে লাইব্রেরী কার্ড। যে বাচ্চাটি এসেছে পৃথিবীর আলোয় এই সেদিন, মিষ্টি করে অবুঝ হাসি আর হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দেয়া ছাড়া তার অন্য কোন ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি নেই, তার জন্য লাইব্রেরী ব্যবহারের কার্ড! সাথে একটি বইও! 'গাড়ি চলে বন্ বন্' ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষায়। আসলে সাউথেন্ড কাউন্সিল চায় জন্মের পর পর প্রতিটি শিশুকে বইয়ের সাথে পরিচিত করতে। তারা মা-বাবাকে অনুপ্রাণিত করে প্রতিদিন শিশুদেরকে বইয়ের গল্প পড়ে শুনাতে, তারা বুঝবেনা মনে করে অবহেলা না করতে। মূলত: শিশুটি ছোট হলেও তার অনুধাবন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে গঠিত হচ্ছে। বই পড়ে শুনানোর ভালো ভূমিকা থাকে এ ক্ষেত্রে। বাচ্চারা যখন বড় হতে থাকে তারা যেন

লাইব্রেরীমুখী হয়, তাদের জন্য তাদের উপযোগী করে সাজানো অংশ রয়েছে। সেখানে অনেক আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। স্কুল ছুটির দিনগুলোতে অনেক বর্ণাঢ্য আয়োজন থাকে লাইব্রেরীতে। বাচ্চারা তখন মা-বাবাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যেতে চাপাচাপি করে। গ্রীষ্মের ছুটির এক দুপুরে আমি আমার বাচ্চাদের লাইব্রেরীতে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। তারা তাদের মত বই নিচ্ছে। খেলছে। কম্পিউটার লগিং করছে। সে ফাঁকে আমি ভাবলাম, আমি কিছু পড়াশুনা করি। আমার চিন্তায় এলো টেমসের মোহনায় অবস্থিত এ শহরের মানুষ কি আমার নবীকে চিনে? চিনলেও কতটুকু? এ পাবলিক লাইব্রেরীতে কি আমার নবীর ব্যাপারে কোন বই আছে? আমি উপরের ফ্লোরে গিয়ে লাইব্রেরী ক্যাটালগ নাড়াচাড়া শুরু করলাম। হ্যাঁ, অমুসলিম অধ্যুষিত এ ছোট্ট শহরেও আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সঃ) এসেছেন তাঁর জীবনী আলোচনা নিয়ে। বইগুলো অমুসলিম লেখকদের হলেও মনে হলো ভাষা শৈলী ও উপস্থাপনায় বেশ আকর্ষণীয় ও ইতিবাচক। ক্লিন্টন বেনেট লিখেছেন `In Search of Muhammad' 'মোহাম্মদের খোঁজে'। জর্জ জর্ডেক অনুবাদ করেছেন `The Voice of Human Justice' 'মানবিক সু-বিচারের কণ্ঠ'। অক্সফোর্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত ছোট্ট বইটির ভূমিকা আমাকে বড়ই বিমুগ্ধ করেছে। জনাথন এ সি ব্র্যাউন তার `Muhammad : A Very Short Introduction' বইয়ের ভূমিকায় কয়েকটি দৃশ্যের শাব্দিক অঙ্কন করে বলেন, এ দৃশ্যগুলো আমি যা এ বইয়ে লিখব তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনেক অর্থসমৃদ্ধ। ড্যানিশ পত্রিকায় নবী মোহাম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা হয়েছে, সে জন্য পৃথিবীজুড়ে শহরে শহরে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে। অথচ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে কটুক্তি, কার্টুন বেরুচ্ছে, সেটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। কোন হৈ চৈ নেই। এ থেকে বুঝা যায় মোহাম্মদ কত অজস্র মানুষের অন্তরে ভালোবাসার রাজত্ব করছে। তাঁর তিরোধানের দেড় হাজার বছর পরেও কত অগণিত হৃদয় ভালোবাসায় তাকে সিক্ত করে রেখেছে। প্রতিদিন মদীনায় গ্রিল দিয়ে বেস্টন করা তাঁর সমাধির পাশে যেতে কত লক্ষ মানুষ উদগ্রীব হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে! সকাতর কণ্ঠে বলছে 'শান্তি ও সম্মান নিবেদিত হোক তোমার প্রতি হে রাসূল'। এক ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ হুইল চেয়ারে বসে আত্মীয় ও গার্ডের সহযোগিতায় সেখানে গিয়ে টপ টপ করে চোখের অশ্রু ঝরিয়ে বলছে, 'হে প্রভু, আমাকে মদীনায় মৃত্যু দাও। তোমার নবীর কাছাকাছি কবরে সমাহিত করো।' এসব অভিব্যক্তি প্রমাণ করে মোহাম্মদ বর্তমান পৃথিবীতে এখানো কত প্রাসঙ্গিক এবং প্রভাবশালী। জনাথন আরো লিখেন, আমি এক ইন্দোনেশিয়ান মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমাদের অনুভূতি কি? তিনি উত্তরে বললেন- `He is our dear Prophet'. তিনি আমাদের প্রিয় নবী।" এ উত্তরে 'আমাদের' শব্দটি খুব সহজে বলে দেয় মুসলিমদের অন্তরে তাঁর সংযোগ কত ঘনিষ্ট ও নিবিঢ়। তার ভাষায় "He is a light kindled in a Muslim's heart from a young age ----.

"মোহাম্মদ হলেন মুসলিমদের অন্তরের আলো যা প্রজ্বলিত করা হয় শৈশব হতে।"

জনাথনের ভূমিকাটি বিমোহিত হয়ে পড়ে অন্য বইয়ের দিকে হাত বাড়ালাম। লেখকের নাম কারেন আর্মস্ট্রং। "Muhammad : A Biography of the Prophet". একই লেখকের আরেকটি বই "Muhammad : A Prophet for Our Time". কারেন আর্মস্ট্রং নামটি আমার কাছে আগেই পরিচিত ছিল। একবার দুবাইর বিশাল এয়ারপোর্টে ট্রানজিটে এদিক ওদিক পায়চারি করার সময় 'ডাব্লিও এইচ স্মিথ' বুকশপে ঢুকেছিলাম। সেল্ফে সাজানো বইগুলোর শিরোনামে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি বইয়ের নাম আমাকে থামিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে তাক থেকে নামালাম। 'History of God' ছিল বইয়ের নাম। ঈশ্বরের ইতিহাস আবার কি? ভাবলাম বইটি কিনে ফেলি পরবর্তী ফ্লাইটে বসে পড়ে নিব। বইটির লেখক ছিলেন 'কারেন আর্মস্ট্রং'। তিনি মূলত খৃষ্টান মহিলা দল (Conent)-র সদস্য ছিলেন। সাত বছর যাবৎ সেখানে যুক্ত ছিলেন। সেখানে তাকে শারিরীক ও মানসিকভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে দাবি করে গার্ডিয়ানে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সে সম্পৃক্ততা ছেড়ে পরে তিনি অক্সফোর্ডে 'ইংরেজি' সাহিত্যে পড়াশুনা করেছেন। পরবর্তীতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং বই প্রকাশ করেছেন। তার বইগুলো খুবই জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত। তিনি মিডিয়াতেও বেশ সক্রিয়।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নিয়ে বই রচনা করেছেন দুটি। বইয়ের ভূমিকায় তিনি পাশ্চাত্যের মানুষের হীনমন্যতার চিত্র এঁকেছেন। তিনি বলেছেন- ছোট কালে না ঘুমালে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য বলা হত 'মোহাম্মদ' আসছে। একটি ভয়ঙ্কর কিছুর নাম ছিল 'মোহাম্মদ'। শৈশব মানসে এমনই চিত্র আঁকা হত। দীর্ঘদিনের ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে তাদের মনে বংশ পরম্পরায় এ ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি তাই মোহাম্মদের জীবনীকে পুনঃ পাঠ করে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে তার সঠিক শান্তিময় অবয়ব বিমূর্ত করতে চেয়েছেন এ বইয়ে। আমি দীর্ঘ সময় বইগুলোতে এমন ডুবেছিলাম ভুলেই গিয়েছিলাম নীচে বাচ্চারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তবে কিছু সময় এখানের পাবলিক লাইব্রেরীতে এসে বুঝতে পেলাম দেড় হাজার বছর পূর্বে আভির্ভূত মরুভূমির নবীটি টেমসের মোহনায় অবস্থিত এ শহরেও পদার্পন করেছেন। তিনি যেমন ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন কাঁচা-পাকা সকল ঘরেই তার মিশন পৌঁছে যাবে কেউ চাক বা না চাক। তা-ই সত্য। আমি এ শহরে প্রবেশের কয়েক ঘন্টা আগে স্বপ্নে দেখেছিলাম মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) একটি গাড়িতে করে দু'জনের মাঝে বসে যাচ্ছেন আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। এ স্বপ্নে হয়ত এমন নির্দেশনা ছিল যেন তার মিশনকে এ শহরে ছড়িয়ে দেই। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে বড় একটি চার্চ মসজিদ ও ইসলামী একাডেমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি রবিউল আউয়ালে মহানবীর (সঃ) জীবনী অমুসলিমদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ড. মোহাম্মদ লাইছ সঙ্কলিত 'Muhammad (Saw) : 1001 Universal Appreciation' শীর্ষক বইটির শত শত কপি বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উচ্চ পদস্থ বহু কর্মকর্তারাও বইটি হাতে পেয়েছেন। এ শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে মুহাম্মদ (সঃ) কে পৌঁছে দেয়া আমাদের লক্ষ্য। প্রতিটি ব্যক্তির চেতনায় তিনি হবেন সম্মানের পাত্র, শান্তির দূত ও মর্যাদার প্রতিমূর্তি এবং তাঁর ধর্ম একমাত্র প্রশান্তির ঠিকানা। মহান প্রভু আমাদের কাজকে মসৃণ করে দেন, করে দেন গতিশীল ও প্রাণবন্ত।

'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

হাফেজ ও সাধারণ বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্যে মাদরাসা বোর্ডের সহায়ক হিসেবে দরসে নেজামি ও মাদানি নেসাবের সমন্বয়ে গঠিত মেথড এবং ইবতেদায়ি ৫ম শ্রেণির শিক্ষা সমাপনি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উপযোগি করে তোলার জন্যে "শর্টকোর্স"

শর্টকোর্স (ডাবল) ও হিফজ বিভাগে

ভর্তি চলছে

আবাসিক • অনাবাসিক • ফুল-টাইম

হাফেজ ও সাধারণ বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে জাতীয় কোনো উদ্যোগ নেই ফলে তারা ছোটদের সঙ্গে ক্লাস করতে লজ্জাবোধ করে এবং শিক্ষা থেকে পিটকে পড়ে। তাছাড়া বড়রা যেহেতু বুদ্ধিমত্তায় ছোটদের চেয়ে এগিয়ে। ছোটরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বয়োজ্যোষ্ঠদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারে না। কনিষ্ঠ ও বয়োজ্যোষ্ঠদেরকে একই সাথে একই প্রতিযোগিতায় অবতারণ করা বিধিসম্মত নয়। তাই দারুল হিকমা মাদরাসা চট্টগ্রাম হাফেজ ও সাধারণ বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য শর্টকোর্স এর ব্যবস্থা চালু করেছে। যাতে হাফেজ ও সাধারণ শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের
বিভাগসমূহ

সাধারণ বিভাগ :
প্লে-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত

হিফজ বিভাগ :
- অন্তত তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন।
- প্রদত্ত সময়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সিলেবাস সম্পন্ন।

শর্ট কোর্স :
- ১ম বছরে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।
- ২য় বছরে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত।

শর্টকোর্সে ভর্তির যোগ্যতা :
- পূর্ণ ৩০ পারা কুরআন মজিদের হাফেজ ও নূন্যতম বয়স ১২ বছর।
- যারা হাফেজ না তাদের ক্ষেত্রে দেখে দেখে পূর্ণ ৩০ পারা কুরআন মজিদ সহিহভাবে পড়তে জানা ও নূন্যতম বয়স ১২ বছর।

সুবিধাসমূহ
- আবাসিক (হোস্টেল সুবিধা)
- অনাবাসিক
- ফুলটাইম (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত)
- ডে-কেয়ার (বিকেল ৩টা থেকে ৫টা- ২ ঘন্টা)

ভর্তি কার্যক্রম আরম্ভ :
- ১১-১৬ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি
- ১৫-২০ জুন ২০১৯ ইংরেজি
- ক্লাস আরম্ভ : ১৮ শাওয়াল, ২২ জুন শনিবার

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস -
আমরা আপনার প্রত্যাশার বীজকে অংকুরোদগম করতে পারব- ইনশাআল্লাহ!

DHMC

দারুল হিকমা মাদরাসা চট্টগ্রাম
সৈয়দশাহ রোড, চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম

01819-009994
01836-924711

Darul Hikma Madrasah Chittagong
darulhikmactg@gmail.com

প্রেমের মিনারে তোমাকে চাই

নুর উদ্দীন শরীফ
শিক্ষার্থী, ৩৭ ব্যাচ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ; আইআইইউসি

হে প্রিয়তম!

ভূপৃষ্ঠে যখন অন্যায়ের রাজত্ব বিরাজমান ছিলো। মানবতা ছিলো সমূলে বিতাড়িত। দুর্বল অসহায়েরা ছিলো প্রতারিত। অন্যায়-অত্যাচারের কবলে অনাথরাও ছিলো নিপীড়িত। গোটা বিশ্ব যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত। মরুর বুকে তখন শান্তির বাণী নিয়ে মরুর দুলাল হয়ে তুমি হয়েছিলে প্রেরিত। অন্ধকার পৃথিবী হয়েছিলো আলোকিত। মা আমেনার মুখ হয়েছিলো আন্দোলিত। স্বামী হারা বেদনা হয়তো হয়েছিলো বিধুরিত। রাজ আদরে তুমি হয়েছিলে লালিত।

প্রিয় প্রেয়!

তোমার শুভাগমনে ধন্য হয়েছে ঊষর মরুভূমি। ধন্য হয়েছে পুরো বিশ্বজগত। সুখের দোলা লেগেছে মানব-দানবসহ কুল মাখলুকাতের হৃদয়ে-হৃদয়ে। এই পৃথিবীর মৃত্তিকা ছুঁয়ে কেবল তুমি হাসোনি, হেসেছিলো আকাশের চন্দ্রিমাও। তোমার আলোকরশ্মিতে ভরে উঠেছিলো অন্ধকার পৃথিবীর প্রতিটি অন্ধকূপ।

তুমি অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আলোর মশাল জ্বালিয়ে দিশেহারা মানুষকে দিয়েছ পথের দিশা। অপূণ্যের পথ ছেড়ে পূণ্যের পথে হেঁটেছে কলুষিত মানব সমাজ। তুমি ন্যায়-অন্যায়ে সমতা সৃষ্টি করেছিলে। অনাশ্রিতরা তোমার কাছে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। দুঃখী অনাথরাও তোমার কাছে এসে সুখানুভব করেছিল। বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিলে পুরো পৃথিবী।

আর নতুন সাজে সেজেছিল বিশ্বজাহান।

প্রিয় মুহাম্মাদ!

সৃষ্টিকর্তা শ্রেষ্ঠ নামটি (মুহাম্মাদ) তোমার জন্যে চয়ন করেছেন। কারণ তুমি যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। কতইনা চমৎকার তোমার 'মুহাম্মদ' নামটি! কত মধুর শোনায়! সৃষ্টিকর্তা কী অপূর্ব নাম দিয়েছেন তোমাকে। যেন প্রতিনিয়ত টপটপিয়ে মধু ঝরে পড়ে মুহাম্মদের ভেতর থেকে। তাই ভালবাসা মিশ্রিত মুহাম্মদ নামটি আমি উচ্চারণ করি। আবার করি। বারবার করি। প্রতিবারই আমি ভিন্ন স্বাদের এক অনন্য অনুভূতি পাই। আমি ক্ষান্ত হই কী করে? কারণ, এ অনন্য স্বাদ-আস্বাদনে তৃপ্ত যে অন্যকিছুতে পাই না। আমি অস্থির হয়ে জপি। জপতে থাকি প্রতিনিয়ত তোমার মধুঝরা 'মুহাম্মদ' নামটি। খু-উ-ব মজা লাগে। দারুণ এক আনন্দ দোল খেলে যায় হৃদয়জুড়ে। যত জপি তত-ই যেন বিশুদ্ধ মধুর ফোঁটাগুলো টপটপিয়ে হৃদয়ের অতলে পতিত হয়। আর একটুআধটু করে স্তিমিত হতে শুরু করে হৃদয়গভীরে প্রজ্বলিত বহুদিনের তোমার প্রেমের অগ্নিশিখা। তখন অন্তরটা দুলে ওঠে অব্যক্ত-অনন্য এক অনুভূতির স্বাদ ও সৌরভে। যে স্বাদের বিপরিতে পুরো সৃষ্টিজগৎ আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

প্রিয়তম নবীজী!

তোমাকে দেখিনি, তবে তোমার আণিত ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন দেখেছি ও পড়েছি। তোমার রেখে যাওয়া মূল্যবান রত্ন শ্রবণ করেছি। যতই তোমার জীবনকথা অধ্যয়ন করি, ততই আমি নতুন করে তোমার প্রেমে উজ্জীবিত হই। কত সুন্দর তুমি! তোমার চরিত্র! তোমার সবকিছু। কতইনা চমৎকার!

আমি দুর্ভাগা। আমি পাইনি তোমার সংস্পর্শ। নিতে পারিনি তোমার সাহচর্য। যাঁরা পেয়েছে তোমার সংস্পর্শ, পেয়েছে তোমার সাহচর্য; তুমি তাঁদের মনের মাধুরী দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলে মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে। বিনির্মাণ করেছিলে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের জন্যে। তুমি তো তাঁদের দিশেহারা মানবের আলোকোজ্জ্বল তারকারূপে অভিহিত করেছো। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঘোষণা করেছেন, 'তাঁরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমিও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট।' কতইনা সৌভাগ্যবান তাঁরা!

প্রিয় মুহাম্মদ!

আমার সৌভাগ্য হয়নি মহামানবদের সারিতে দাঁড়ানোর। সৌভাগ্য হয়নি তোমার দর্শন লাভেরও। আমি তো দুর্ভাগা। যাঁরা তোমার দর্শন লাভ করেছে ইতিহাস তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অংকিত করেছে। তোমার সত্যিকারের প্রেমিকতো ছিলো তাঁরাই। তাঁদের প্রেমে ছিলো না কোন অপূর্ণতা। উদ্যত ছিলেন সর্বদা নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে তোমার তরে। চৌকান্ন থাকতেন তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে। তাঁদের মতো

অতন্দ্র প্রহরী হতে সৌভাগ্যেতো জোটেনি আমার; আমার প্রেমে অপূর্ণতা আছে। তাঁদের ন্যায় ভালোবাসি কিনা তা আমি বলতে পারবো না। তবে এটা বলতে পারি, আমার ভালবাসার ঘরে তুমি দ্বিতীয়। আমি আমার প্রেমকে পূর্ণতায় ভরে নিয়ে চাই।

হে পরম প্রিয় আমার!

আজ আমি অস্থির! তোমাকে একটু দেখবো বলে। তোমার একটু পরশ নেবো বলে। সর্বক্ষণ হৃদয়ে অস্থিরতা বিরাজমান। কখন যে মিলবে তোমার দীদার! হৃদয়ে কতো ছবি এঁকেছি তোমার! নিদ্রাচ্ছন্ন বিছানায় অপেক্ষমাণ আমি। সর্বদা অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকি। জানি না কখন শেষ হবে অন্তহীন অপেক্ষার প্রহর। জানি শুধু সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে একদিন দীদার পাবো তোমার। তোমার মোবারক হাতে হাত মেলাবো। আবেগাপ্লুত হবো তোমায় দেখে। অপলক দৃষ্টিতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকবো। আর মুহূর্তেই নিঃশেষ হবে আমার সব দুঃখ-বেদনা। আনন্দে টইটম্বুর হবো আমি। অপূর্ণ হৃদয় পূর্ণতা লাভ করবে তোমার ভালোবাসায়। হৃদয় খুলে ভালোবাসা মিশ্রিত সব আকুতিগুলো অনায়াসে প্রকাশ করবো তোমার তরে।

হে রাহমাতুল লিল আ'লামিন!

তুমি উম্মতকে কতইনা ভালোবাস! এর তো কোন উপমাই আমি খুঁজে পাই না। রক্তেরঞ্জিত হয়েছ তুমি উম্মতকে সৎপথের সন্ধান দিতে গিয়ে। তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে পেটে পাথর বেঁধেছিলে দীনের আলো ছড়াতে গিয়ে। কত ত্যাগ স্বীকার করেছিলে তুমি এ নিষ্ঠুর উম্মতের জন্যে! তবুও তুমি ক্ষান্ত হওনি। হওনি ক্রোধান্বিতও। কত দরদ তোমার উম্মতের প্রতি! আহ কতো মায়া!

আমি নিষ্ঠুর উম্মত তোমার কষ্ট বিন্দুমাত্রও কি উপলব্ধি করতাম! তোমার দরদের অণুতমও কি মূল্যায়ন করতাম! না।

আর তাই তুমিই উম্মতের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

প্রিয় হাবিব!

তুমি অশ্রুজলে সিক্ত হতে শুধু উম্মতের দরদে। 'রওজাতেও' তুমি নেত্রজলে সিক্ত হচ্ছ। কত ভালোবাসা তোমার উম্মতের প্রতি! উর্ধ্বজগতে গিয়েও তুমি স্বরণ রেখেছিলে নিষ্ঠুর উম্মতকে। বিচার দিবসে দারুণ থেকে নিদারুণ অবস্থায় সকলে ইয়া নাফসী-ইয়া নাফসী বলে অস্থির হয়ে যাবে। আর তুমি বিচার দিবসের মালিকের শাহী দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে উম্মাতি-উম্মাতি বলে। মাগফিরাত কামনা করবে উম্মতের জন্য। কতো দয়া তোমার!

প্রিয় মুহাম্মদ আমার

হে প্রেমের মিনার আমার!

তপ্ত হৃদয়ের আকুতি একটু শুনো! হাসসান বিন সাবেত (রা.)-র কলম ও উমর (রা.)-র জবান তো আর আমার নেই। তাই আমি জানান দিতে পারি না তোমার প্রেমে অস্থির আমার অন্তরের আকুতি, তৃষ্ণার্ত মনের মিনতি ও ধুকধুকে হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ। তুমি তো বোঝো তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার সত্যতা, স্বচ্ছতা ও গভীরতা। তাহলে কেন এত উপেক্ষা! কীসের এ পর্দা! আমি বুঝি না। কিচ্ছু বুঝি না। আমি শুধু তোমার একমুহূর্ত দীদার চাই, হে প্রিয়তম মুহাম্মদ!

সংকল্প প্রকাশন
জ্ঞানান্তরের ঘূর্ণিপাকে

সৃজনশীল ও ইসলামিক সকল প্রকাশনীর
বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

যে সমস্ত পাবলিকেশনের বই পাওয়া যায়ঃ-
- সিয়ান পাবলিকেশন
- রুহামা পাবলিকেশন
- আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন
- গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
- সীরাত পাবলিকেশন
- সমকালীন প্রকাশন
- সবুজ পত্র প্রকাশন
- মাকতাবাতুল আসলাফ
- মাকতাবাতুল বায়ান
- পিস পাবলিকেশন সহ

গুলজার টাওয়ার (৩য় তলা)
২৮ নং দোকান, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
০১৮৪৫৮৭৬৭০৫, ০১৯১৭১২৭৭৪৯, ০১৭১৯৭৯১৩১১

দেশের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামিক প্রকাশনার
বই সুলভ মূল্যে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

শিশু চরিত্র গঠনে বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্
সম্পাদক, মাসিক ই-উজ্জীবন

মানব জীবনে চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ তার মনে প্রোথিত মূল্যবোধ ও গুণাবলির আলোকেই সম্পাদিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, মান-সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের মানসিক বিকাশ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপরই নির্ভর করে।

আমাদের শিশু-কিশোররাই কাঙ্খিত সমাজ গঠনের মূল ক্ষেত্র। যদি আমরা শিশুদের আদর্শ-চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দিতে চাই, তাহলে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- নিঃসন্দেহে আপনি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। (সূরা কলম: ৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব: ২১) তাই আসুন শিশু-কিশোরদের প্রতি মহানবীর আদর্শ কেমন ছিল তা আমরা পর্যালোচনা করি।

শিশু-কিশোরদের মন অত্যন্ত কোমল ও পবিত্র। তাদের মনে যদি কোন বস্তু (ভাল-মন্দ) স্থান করে নেয়, তা তাদের ভবিষ্যত জীবনেও থেকে যায়। তাই শিশু-কিশোরদের সাথে কখনো খেলার ছলেও মিথ্যা বলা প্রতারণা করা ঠিক নয়। রাসূল (সা.) শিশু-কিশোরদের সাথে সরল-সত্য ও মধুময় ব্যবহার করেছেন এবং আমাদেরকেও করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমার মা আমাকে ডাক দিয়েছেন, এমতবাস্থায় যে, রাসূল (সা.) আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। মা বললেন, এদিকে এস আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। তখন রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী দিতে চাও? আম্মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূল (সা.) বললেন- তুমি ওকে কিছু দেবার জন্য ডেকে যদি না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় তিনটি মিথ্যে যোগ হয়ে যেত।

রাসূল (সা.) ও হাসি-কৌতুক করতেন; কিন্তু আনন্দ ফূর্তির জন্য তিনি মিথ্যা কোন কিছু বলতেন না। একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা.) বললেন- অসত্য বা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কিছু বল না।

রসিকতার ব্যাপারে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) এক বৃদ্ধাকে বলেছিলেন, বৃদ্ধারা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা পেরেশান হয়ে আরয করলো, তাদের অপরাধটা কী? নবী করীম (সা.) বললেন- তুমি কী কুরআনের এ আয়াত পড়নি? "আমরা তাদেরকে (নারীদেরকে) পূণরায় এমনভাবে সৃষ্টি করবো যে তারা হবে কুমারী, সমবয়স্কা।" (সূরা ওয়াকিয়া: ৩৫-৩৭) এই ছোট্ট ঘটনা থেকে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) রসিকতার মধ্যেও কেমন সত্য কথাটি প্রকাশ করেছেন। তাই প্রত্যেক মা-বাবার উচিত শিশুদেরকে সত্য ও আদর্শ শিক্ষা প্রদানের জন্য জীবনের শুরু থেকেই তাদের সাথে সাবধানে কথাবার্তা বলা। অন্যথায় শিশু চরিত্র অংকুরেই বিনষ্ট করার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রকট।

শিশু যখন একটু বড় হয়, তখন তার হাতে বই-খাতা দিয়ে স্কুলে মক্তবে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাতে মা-বাবার সাথে শিক্ষকেরও দায়িত্ব চলে আসে শিশুর আদর্শ জীবন, উন্নত চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধের যথাযথ ধারণা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার। বইপত্রে যেসব কিচ্ছা-কাহিনী থাকে, তার ভাল-মন্দ উভয় দিকের স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা শিক্ষক ও মা-বাবার এমনই একটি দায়িত্ব, যাতে শিশুর সত্যের প্রতি আগ্রহ এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা জন্মা স্বাভাবিক হয়ে উঠে। রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন "লোকদের নিজস্ব পরিবার সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে।" (মুসনাদে আহমদ) এ হাদীসের আলোকে পরিবারের প্রধানের দায়িত্ব তার অভিভাবকত্বের অধীনে যারা থাকে তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান এবং সচ্চরিত্র আল্লাহভীরু মানুষ তৈরী করা।

আমরা যদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের জীবনের প্রতি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, তারা কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহভীরু ও খাঁটি মু'মেন হিসেবে গড়ে তুলতে কত তৎপর ছিলেন। পবিত্র কুরআনে হযরত লোকমান (আ.) তার ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন- "হে বৎস! নামায কায়েম করো, সৎ কাজে আদেশ করো, এবং খারাপ কাজে নিষেধ করো, এবং যে কোন বিপদই আসুক না কেন, সে জন্য ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় এ কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্যতম। (সূরা লোকমান: ১৭) হযরত লোকমান (আ.) তার মৃত্যুকালীন সময়ে তার সন্তানদেরকে যে উপদেশ দিয়ে ছিলেন, তা শিশু-কিশোরদের তারবিয়্যাতের জন্য কতইনা সুন্দর উদাহরণ। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? তখন সে নিজ পুত্রগণকে বলেছিলেন, আমার পরে তোমরা কোন জিনিসের ইবাদত করবে? তারা বলেছিল আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য- সে অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদত করবো, এবং আমরা তারই অনুগত থাকবো। (সূরা বাকারা; ১৩৩)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার এক বেদুইন রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। রাসূল (সা.) তখন একটি ছোট্ট ছেলেকে আদর করছিলেন। বেদুইন রাসূল (সা.)-কে বললো, আপনারা নিজেদের সন্তানদের আদর করেন! আমরা কিন্তু করি না। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার হৃদয় থেকে ভালবাসা উদয়ের প্রবণতাকে কেড়ে নেয় তাহলে আমি কী করতে পারি।

মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে শিশু-কিশোরদের প্রতি স্নেহ ভালবাসার অনেক ইতিহাস রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত যাদে বিন হারেছার ভালবাসার ইতিহাসই শীর্ষে। তিনি ছিলেন হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)-এর ক্রীতদাস। অথচ রাসূল (সা.)-এর ভালবাসার বদৌলতে হয়ে গেলেন হিব্বু রাসূলিল্লাহ বা রাসূলুল্লাহর প্রীতিভাজন। পেয়ে গেলেন তার সন্তানের মর্যাদা। এ যায়েদের পুত্র হযরত উসামার প্রতিও ছিল রাসূল (সা.)-এর গভীর ভালবাসা। শিশু হযরত উসামা একবার দরজার চৌকাঠে ধাক্কা লেগে তার কপাল থেকে রক্ত ঝড়তে লাগল। রাসূল (সা.) হযরত আয়েশাকে রক্ত মুছে দিতে বললেন, কিন্তু তাতেও তিনি স্বস্তি পেলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে পবিত্র হাতে রক্ত মুছে ক্ষত স্থানে চুমু দিতে লাগলেন এবং মিষ্টি-মধুর কথা বলে তাকে শান্তনা দিতে লাগলেন। রাসূল (সা.) যেমন নিজে শিশু-কিশোরদের ভালবাসতেন, তেমনি তার পরিবারের সকল শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। রাসূল (সা.)-এর শিশুপ্রীতি ফুটে উঠে নিম্নোক্ত হাদীসে। একবার রাসূল (সা.)-এর নিকট এক শিশুকে আনা হলে তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, এরা মানুষকে ভীরু ও কৃপণ করে দেয়, অথচ এরা হলো আল্লাহর ফুল।

একটি পরিবারের শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে রয়েছে কোমলতা ও পরস্পরে ভালবাসা। এ ব্যাপারটি বোঝাতে রাসূল (সা.) হযরত আয়েশাকে নির্দেশ দেন, হে আয়েশা! কোমলতাকে নিজের জন্য অনিবার্য করে নাও এবং কঠোরতা ও লজ্জাহীনতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো: কেননা যার মধ্যে নম্রতা ও কোমলতা আছে সে নম্রতাই তার শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যার থেকে নম্রতা ও কোমলতা উধাও হয়ে যায় তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। (মেশকাত)

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক ও ভবিষ্যত। আমরা যদি আমাদের শিশুদেরকে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে সৎচরিত্রবান করে গড়ে তুলি, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে তারা তাদের মতই করে গড়ে তোলার প্রয়াস পাবে। এ ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠতে শুরু করবে সুন্দর, শান্তিময় পরিবার আর ক্রমান্বয়ে সমাজ, জাতি ও দেশ।

মাসিক দাওয়াহ

এক মহিয়সী মা-এর শৈশব

জিয়াউল হক
গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার, লন্ডন প্রবাসী।

আজ থেকে অনেক আগেকার কথা। সেই ৫৬০ কিংবা ৫৬১ খৃষ্টাব্দ অথবা তার কাছাকাছি সময়কালের কথা। স্থান ইয়াসরিব। আজ যে শহরটিকে সারা বিশ্ববাসী মদিনা বলে জানে, সেই ইয়াসরিব। খেজুর বাগান ঘেরা মা উদ্যানময় একটা ছোট্ট গ্রাম।

এই গ্রামেরই একটা ধুলি কংকরময় পথ ধরে একটা বাচ্চা মেয়ে, কতইবা হবে বয়স, বড় জোর নয় বা দশ বৎসর একলা হেঁটে চলেছে। ছোট্ট উচ্ছল ও প্রাণবন্ত বাচ্চারা যেমনটা করে থাকে, চলতে চলতে একরাশ উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে সামনে পেছনে উপরে নিচে সব দিকেই আগ্রহ নিয়ে দেখতে দেখতে যায়, যাত্রা পথ ভুলে কখনও থেমে আগ্রহ নিয়ে কোন একটা জিনিস বা কোন একজনকে খুব ভালো করে খেয়াল করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এর পরে আবার পথ চলা শুরু করে। এ মেয়েটার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মেয়েটা তার নিজ বাড়ি থেকে অনতিদূরের এক পল্লীতে তারই এক বান্ধবির কাছে যাচ্ছিল। সময়টা ছিল সকাল গড়িয়ে গেছে বটে, তবে দুপুরও হয়নি। পথে যেতে যেতে হঠাৎ করেই মেয়েটা লক্ষ্য করলো তার সামনে মাটির উপরে একটা কিছু পড়ে আছে, চক চক করছে। আগ্রহ ভরে নীচু হয়ে চোখ দুটোকে আরও কাছে নিয়ে দেখলো জিনিসটা কি?

আরে! এ যে একটা স্বর্ণমুদ্রা! বাবা ব্যবসা করতেন। বাচ্চা মেয়েটা বাবার বড় আদুরে মেয়ে, একমাত্র মেয়ে। বাবার হাত থেকে কতদিন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখেছে, কাজেই পথে পড়ে থাকা একটা স্বর্ণমুদ্রাকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছে, বেশি বেগ পেতে হয়নি। মেয়েটা পথে পড়ে থাকা সেই স্বর্ণমুদ্রাটাকে হাতে তুলে নিয়ে এবারে তা দেখতে দেখতেই আবার যাত্রা শুরু করলো। চলতে চলতে এক সময় সে তার বান্ধবির বাড়িতে এসে হাজির।

দুই বান্ধবীর বাড়িতে সে প্রায়ই আসে। দু'জনে এক সাথে খেলা করে, গল্প করে, কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার সে নিজ বাড়িতে ফিরে যায়। বান্ধবিও ঠিক একইভাবে তার বাড়িতে যায়, সেখানে তারা দুজনে একইভাবে গল্প ও খেলাচ্ছলে সময় কাটায়। পাড়ার সবাই তাদের খুব ভালো মেয়ে হিসেবে যেমন জানে, ঠিক এটাও তারা জানে যে, দু জনে পরস্পর পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও বটে।

মেয়েটা আজ কেন যেন তার খেলায় মন বসাতে পারছে না। বান্ধবির বাড়িতে এসেছে বটে, দু'জনে বসে খেলছে, গল্প করছে, কিন্তু তারপরেও তার ছোট্ট মনের ভেতরটায় এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। সে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না খেলায়। বার বার তার মনে ভেঁসে উঠছে একটা প্রশ্ন, আচ্ছা, পথে পড়ে পাওয়া এই স্বর্ণমুদ্রাটা কার?

এটা এমন একটা সময়কাল ও এমন একটা জনপদ, যে সময়কালে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রাই ছিল পণ্য কেনা বেচা বা লেন দেনের প্রধান বিনিময় মাধ্যম। আর এই জনপদ ছিল প্রচন্ড অভাবী জনপদ। এখানে একজন মানুষ একটা রৌপ্যমুদ্রার জন্যই সারাদিন, এমনকি, কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ অমানুষিক খাটুনি খাটে। সেখানে একটা স্বর্ণমুদ্রা হাতে পাওয়া যেমন তেমন, তা চোখে দেখাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারো কাছে একটা স্বর্ণমুদ্রা থাকা মানে সে ব্যক্তি মোটামুটি স্বচ্ছল ঐ সমাজে। ঐ সমাজে খুব কমসংখক লোকের হাতেই স্বর্ণমুদ্রা দেখা যেতো। তা ছাড়া লোকজন তাদের অর্থকে স্বর্ণমুদ্রার আকারেই জমা করতেন। কারো কাছে স্বর্ণমুদ্রা থাকা মানেই হলো তার কাছে উদ্ধৃত অর্থ মওজুদ থাকা

ছোট্ট মেয়েটার এতসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বাস্তবতা ছোট্ট ঐ মেয়েটার বোঝার কথা নয়। ঐ একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কতটা সম্পদ কেনা যায় বা যেতে পারে, কিংবা ঐ একটা স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করতে কতটা শ্রম ও মেধা খরচ করতে হয় তার অর্জনকারীকে, সেটাও তার উপলব্ধীতে থাকার কথা নয়। সে তা জানেও না। তবে মেয়েটা তার ব্যবসায়ী বাবার সুত্র ধরে এতটুকু অন্তত জানে যে, এটা খুব দামী, মহার্ঘ ও মূল্যবান একটা সম্পদ তার মালিকের জন্য।

এই মহার্ঘ বস্তুটা পথে অবহেলায় পড়ে ছিল, মানে হলো এটা কারো কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। না জানি, স্বর্ণমুদ্রাটা কার? আহারে, বেচারা হয়তো খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। মেয়েটার মনের কোণে একটা বেদনা জেগে উঠছে বার বার। এই বেদনাবোধই বান্ধবীর সাথে তাকে খেলাতে বা গল্পে মন বসাতে দিচ্ছে না।

মেয়েটা উঠে বান্ধবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। যে পথ দিয়ে এসেছিল, ঠিক সে পথেই ফিরে চলছিল। তবে এবারে তার নজর অন্য দিকে। ছোট্ট ঐ মেয়েটার বুদ্ধির প্রখরতটা বোঝায় যায় এ ঘটনা থেকে, মেয়েটা এবারে ধীর লয়ে পথ চলতে

চলতে আশে পাশে চলমান লোকজনকে খেয়াল করতে লাগলো, কেউ কি কিছু একটা খুঁজে ফিরছে পথে?

এভাবে চলতে চলতে মেয়েটা একসময় সেই স্থানও পেরিয়ে গেল যে স্থানে আসার সময় সে এই স্বর্ণমুদ্রাটা পেয়েছিল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো মেয়েটা। একবার ভাবলো স্বর্ণমুদ্রাটা যেখানে কুড়িয়ে পেয়েছিল, সেখানেই আবার সে ফেলে রেখে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবলো, না, তা হলে অন্য কেউ যদি কুড়িয়ে নিয়ে যায় আর এর মালিকের সন্ধান না করে নিজেই খরচ করে ফেলে, তা হলে তো এর মালিক আর কোনদিনই তা ফিরে পাবে না। এর চেয়ে বরং এই ভালো যে, সে নিজেই খোঁজ করে দেখবে, মালিক পাওয়া যায় কি না, পেলে তাকে ফেরত দেবে, আর না পেলে বাড়িতে গিয়ে মা'কে বলবে পুরো বিষয়টা।

এমনটা ভাবতে ভাবতে মেয়েটা এগোচ্ছিল ধীর পা'এ। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, এক অতিশয় দূর্বল বৃদ্ধ একটা শুকনো খেজুরের ডালকে লাঠি বানিয়ে তারই উপর ভর করে, মাটির দিকে দু চোখ জড়ো করে দেখতে দেখতে রাস্তার একটা ধার দিয়ে হেঁটে আসছেন। বুড়োটা এতটাই দূর্বল যে, তিনি ঠিক মত হাঁটতেও পারছেন না, যেন কাঁপছেন।

ছোট্ট মেয়েটা ত্বরিৎ গতিতে এগিয়ে গেল বৃদ্ধের দিকে, জিজ্ঞেস করলো তিনি কি খুঁজছেন? বৃদ্ধ ছোট্ট একটা বাচ্চা মেয়ের প্রশ্নে অনেকটা হতাশ কণ্ঠেই বলে উঠলেন: বাছা, আজ দুটো দিন একটা দানা পানিও পেটে পড়েনি দেখে অনেক দিনের সঞ্চিত একটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম, ক'টা যব কিনবো বলে, সেটাই কোথা যে ফেলেছি, আর খূঁজেই পাচ্ছি না। এ পথেই তো যাচ্ছিলাম----। বলেই বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন।

এতক্ষণে মেয়েটা বুঝলো, যে, সে যে স্বর্ণমুদ্রাটা পেয়েছে, সেটা এই বৃদ্ধেরই। কিন্তু লোকটা যে বললেন, তিনি দুটো দিন কিছুই খান নি! আহারে, তিনি ক্ষুধায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন! মেয়েটার খুব মায়া হলো বৃদ্ধ লোকটার জন্য। সে বলে উঠলো, আমার সাথে আসুন, আমি আপনার স্বর্ণমুদ্রাটা খুঁজে দেবো। চলুন আমার বাড়িতে, আমার মা'র কাছে।

হারানো স্বর্ণমুদ্রা ফিরে পাবেন তিনি, এমন সম্ভাবনার কথা ছোট্ট এই মেয়েটার মুখে বড্ড বেমানান শোনালো! বৃদ্ধ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে বসা চোখ জোড়া কুঁচকে মেয়েটার মুখের দিকে একবার খুব ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা তার একটা হাত ধরে এগোতে শুরু করেছে, তার বাড়ির দিকে।

বাড়িতে এনে বৃদ্ধকে বসিয়ে মেয়েটা এক দৌড়ে মা'র কাছে গিয়ে হাজির। আদ্যোপান্ত এক নি:শ্বাসে সব বলে গেল মা'কে, সেই সাথে মা'র হাতে সেই স্বর্ণমুদ্রাটাও তুলে দিল। মা তার ছোট্ট মেয়েটার বুদ্ধিমত্তা, সততা আর মায়ার উপস্থিতি দেখে খুবই খুশি হলেন। তিনি মেয়েকে বললেন, বৃদ্ধের হাতে স্বর্ণমুদ্রাটা ফেরত দিতে, ততক্ষণে তিনি ঐ বৃদ্ধের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছেন, বলেই তিনি রান্নাঘরের দিকে চললেন।

মা'র কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কথাগুলো শুনে মেয়েটা খুব খুশি হলো, এক দৌড়ে এসে সেই বৃদ্ধের হাতে তুলে দিল স্বর্ণমুদ্রাটা: দেখুন তো এটাই আপনার হারানো সেই স্বর্ণমুদ্রা কি না।

বৃদ্ধ আগ্রহভরে বাচ্চা মেয়েটার হাত থেকে স্বর্ণমুদ্রাটা নিয়ে চোখজোড়া খুব কাছে নামিয়ে আনলেন, আরে, এটা তো তারই সেই স্বর্ণমুদ্রাটা! ঐ যে, এক কোণায় সেই ময়লা দাগটা এখনও লেগেই রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ঘরে মাটির নীচে পুঁতে রাখার কারণে ঐখানটায় ময়লা একটা গাদ পড়ে গেছে, সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখনও!

বৃদ্ধ খুব খুশি হলেন তার হারানো ধন ফিরে পেয়ে, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন ততক্ষণে তাঁর সামনে এক থালা খাবার।

আজ দু'দিন বৃদ্ধ অভুক্ত, ক্ষুধায় কাতর তিনি। ছোট্ট মেয়েটার অনুরোধে বৃদ্ধ খাবারটুকু তৃপ্তি ভরে খেলেন, আর এর পরে যাবার আগে বার বার মেয়েটার হাত দিয়ে দোওয়া করলেন।

এই যে ছোট্ট মেয়েটা, যার সততা, আর আমনতদারীতা, ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মীতা, বাড়িতে ডেকে এনে খাবার খাইয়ে দেওয়া, এইসব গুণাবলী খুব অচিরেই তার গর্ভের সন্তানের মধ্যেও দেখা যাবে। এই মেয়েটা আর কেউ নন, তিনি আমাদের নবীজননী মা আমিনা। এর মাত্র একটি দশক বা তার কাছাকাছি সময় পরে এসে এই নারীর গর্ভেই জন্ম নেবেন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়কর এক মানবিক চরিত্র, আল আমিন: আমার প্রিয় নবী, প্রিয় মুস্তাফা (স:)।

রাসূলের সাথে দিনাতিপাত

উম্মে সায়েমা তাযকিয়া
খন্ডকালীন শিক্ষিকা, দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

মদিনার নিস্তব্ধতায় শুরু হয় বেলালের সুমধুর আযান। আজানের উত্তর দিতে দিতে বিছানা ছাড়েন তিনি। ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিয়েই দিনের শুরু...

জ্বী, আজকে আমরা দিন কাটাবো মহান স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।

এই মহা মানবের জীবনী তথা সিরাতুন্নবী পড়েননি এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। তবে আজকে আমরা জানবো, কেমন ছিলো উনার দিনগুলো। কীভাবে কাটাতেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

মিসওয়াক সেরে মসজিদে নববীতে আসলেন নবীজি অতঃপর সংক্ষেপে দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন প্রায় সময় ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন সূরা ইখলাস।

ফজরের নামাজের আগে এই দুই রাকাত নামাজের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, "তামাম দুনিয়া আর এর মাঝে যা কিছু আছে সবচেয়ে আল্লাহর কাছে এই দুই রাকাত নামাজ প্রিয়"।

কখনও বা এই দুই রাকাত নামাজ তিনি ঘরেই পড়তেন। নামাজ শেষে স্ত্রীদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে তাদের সাথে খোশালাপ করতেন। একজন স্ত্রীর দিনের শুরুটা যদি এমন হয় তাহলে কেমন হয়!

এদিকে মসজিদে নববীতে সাহাবীরা জড়ো হতে থাকেন সবাই রাসূলের সাথে নামাজ আদায় করবেন। বেলাল (রা.) দরজার কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! নামাজের সময় হয়েছে... নবীজী তৎক্ষনাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে আসেন নামাজের জন্য।

অপলক দৃষ্টিতে সাহাবীরা তাকিয়ে আছেন তাঁদের প্রাণপুরুষের সুধীরলয়ে এগিয়ে আসা। অতঃপর সবাই দাঁড়িয়ে যান সারিবদ্ধভাবে এক সুতার মালার মত করে নামাজের জন্য।

এদিকে বেলালের একামত শেষ। নামাজে দাড়িয়ে নবী (সা.) আরেকবার পেছনে ফিরে দেখছেন সবাই ঠিক মতো দাঁড়িয়েছে কি না।

এরপর ছোট বড় সূরা দিয়ে দু'রাকাত ফরজ নামাজ শেষ করে সালাম ফিরিয়ে শুধালেন:

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام،
تباركت يا ذا الجلال والإكرام

"হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, তাবৎ শান্তি আপনার থেকেই আপনি চির কল্যাণময়। হে মহিমান্বিত হে মহা সম্মানিত।"

এরপর আল্লাহর প্রশংসামূলক নানা ধরনের জিকির, দুয়া ও ইস্তেগফার করতেন এবং কালাম পাকের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতঃ সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নামাজের জায়গায় অটল থাকতেন।

অতঃপর সাহাবীদের দিকে ঘুরে ফিরতেন। উনারাও ভোরের সোনালী আভায় নবীজির চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন অপলক নয়নে।

মাঝে মাঝে ভাবি, কী সুখময় ছিল সেইসব চেহারাগুলো, যাদের দিন শুরু হতো নবীজির দীপ্তিময় চেহারা দেখে!!!

এমন সমুজ্জল চেহারা দেখেই কোন এক সময় আব্দুল-লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছিলেন:

"খুব ভালো করে যখন আমি দেখলাম, বুঝলাম এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদী হতে পারে না।"

সুবহানআল্লাহ!!

এরপর সাহাবীদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন এ সময়ে। কেউ অসুস্থ আছে কিনা জানতে চাইতেন, অসুস্থ না থাকলে কারো জানাজা আছে কিনা জানতে চাইতেন। অনুপস্থিত সাহাবীদের খোঁজ খবর নিতেন। কেউ অসুস্থ থাকলে দেখতে চলে যেতেন।

অনেক সময় সকালের নাস্তা করতেন, অনেক সময় খাবার না থাকলে বলতেন "আমি রোজা"!

ক্লান্তি কাটাতে কখনো মুহাজিরদের খবর নিতে তাদের কাছে চলে যেতেন, কখনো বা আনসারদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতেন, অথবা চলে যেতেন ফাতেমা (রা.) এর ঘরে, স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতেন হাসান-হোসেনকে অথবা জয়নাব (রা.) এর কন্যা ওমামাকে।

অতঃপর দ্বিপ্রহরের হালকা বিশ্রাম ছেড়ে যোহরের প্রস্তুতি নিতেন।

মেসওয়াক শেষে মসজিদে নববীতে নামাজের জন্য প্রবেশ করতেন।

ঢুকে প্রথমে চার রাকাত নামাজ পড়তেন আর বলতেন: "এ সময় জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়, এমন সময় আমার একটা ভালো আমল আসমানে উঠুক সেটা আমার খুব পছন্দ।"

মাঝে মধ্যে এ সময় উনার নাতি-নাতনিদেরকে কোলে নিয়েই ইমামতি করতেন।

এ রকম একবার সিজদায় গিয়ে নবীজী অনেকক্ষণ পরে রইলেন, অতঃপর সাহাবী শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা.) কিঞ্চিত মাথা তুলে দেখলেন নবীজীর ওপর উনার এক নাতি বসে আছেন!

আবার কখনো কখনো পেছন থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দিতেন।

দ্বিপ্রহরের তন্দ্রা সেরে বেশ সতেজ সাহাবীরা প্রিয় নবীর মুখ থেকে তালিম শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।

তিনিও উন্মুখ হয়ে তাদেরকে তালিম দিতেন, কখনো বা এরই মাঝে আসমান থেকে কোন বার্তা নিয়ে হাজির হতেন জিব্রাইল (আ.)।

গুরুতর কোনো বিষয়ে আলোচনা থাকলে অনেক সময় যোহর গড়িয়ে আসর হয়ে যেত, অনেক সময় সুন্নত শেষে বিবিদের হুজরাতে গিয়ে হালকা বিশ্রাম নিতেন, মাঝে মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন।

বেলালের (রা.) দরদ মাখা সুরের আযানের আওয়াজ শুনে নবীজি উঠে আসতেন আসরের নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জড়ো হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। আসরের ওয়াক্ত যুহরের মতই শুরুর দিকেই তিনি নামায আদায় করতেন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি সব ফরজ নামাজই শুরুর দিকে আদায় করে ফেলতেন শুধু ইশা ছাড়া।

আসর নামাজের পরে সাহাবায়ে কেরামদের সাথে উনি খুব কমই আলাপচারিতা করতেন। বেলা শেষে সবাই যে অনেক ক্লান্ত। কাজকর্ম সেরে ফিরে যেতে হবে, রাতের খাবার তৈরি করতে হবে এগুলো মাথায় রাখতেন তিনি।

তিনিও তার পরিবারকে সময় দিতেন নিরালায়। দিন শেষ করতেন সে রাতে যেই স্ত্রীর ঘরে থাকার কথা তার ঘরে এসে।

পরিবারের সাথে যতক্ষণ থাকতেন খুব আনন্দময় সময় কাটাতেন নবীজি। ফাঁকে ফাঁকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন হতো, জ্ঞানচর্চা হতো, সমাধান খোঁজা হত।

এরপর রাতের খাবার খেতেন। সারাদিনের মূল খাওয়া-দাওয়া এ সময়েই হত।

সবার শেষে তিনি আঙ্গুল চেটে নিতেন এবং থালা মুছে খাওয়ার কথাও বলেছেন অনেক সময়।

খাবার পর এবং দুধ পান করার পর তিনি কুলি করতেন এবং বলতেন দুধে চর্বি থাকে।

স্ত্রীদের সঙ্গে খেতে বসলে মাঝে মাঝে তাদের মুখেও লোকমা তুলে দিতেন।

সাহাবায়ে কেরামদেরকে উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি বলতেন: "তোমাদের স্ত্রীদের মুখে যে লোকমাটি তুলে দেবে তা তোমাদের দানের সওয়াব দেবে"

এমন নৈশভোজে কি শুধুই পেট ভরে? মনটাও যে ভরে যায়?!! সুবহানআল্লাহ!!

অতঃপর এশার আযান না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তিনি আপনজনদেরকে সময় দিতেন।

আযান হয়ে গেলে সাথে সাথে বেরিয়ে পড়তেন না। সচরাচর এশার সালাত দেরিতে করতেন তবে অত দেরি না যাতে মানুষের জন্য কষ্টকর হয়।

এশার পর সাধারণত তিনি সাহাবীদের সাথে তেমন বেশি কথা বলতেন না, বললেও খুব অল্প।

দিন শেষে সবাই ক্লান্ত, ঘুমাতে যাবে সবাই, তাই তিনি পছন্দ করতেন না এশার পরে লম্বা সময় জেগে থাকা।

বাসায় ফিরে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। এরপর ঘুমাতে যেতেন। সাধারণত তিনি মাঝরাত অবধি ঘুমাতেন। মাঝ রাতে অথবা তার আরেকটু আগে বিছানা ছেড়ে উঠতেন।

তারপর রাতের নিস্তব্ধতায় তিনি শুরু করতেন তাহাজ্জুদের সালাত।

মাঝেমধ্যে মসজিদে শেষ রাতের সালাত পড়তে দেখা যেত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার একবারের ঘটনা। তিনি বর্ণনা করেন: "এক রাতে তাকে বিছানায় না পেয়ে ভাবলাম তিনি কি অন্য কোন ঘরে গেছেন নাকি, খুঁজে না পেয়ে ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম সম্ভবত রুকু বা সিজদায় লুটিয়ে আছেন, আর পাঠ করছেন: سبحان الله والحمد لله ولا إله غيرك

আমি তখন মনে মনে বললাম কী অসাধারণ মানুষ আপনি! আপনি মশগুল থাকেন এক বিষয় নিয়ে, আর আমি ব্যস্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা নিয়ে!!

অতঃপর রাতের যখন আরো সামান্য কিছু বাকি থাকে তিনি আবার একটু শুতে আসতেন। ফজরের সালাত আর নতুন ভোরের ব্যস্ততার প্রস্তুতি স্বরূপ একটু জিরিয়ে নিতেন।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) উল্লেখ করেছেন, সারাদিনে নবীজির সালাত ছিল ৪০ রাকাত, প্রায় সময়।

যার মধ্যে ১৭ রাকাত ফরজ ১০ বা ১২ রাকাত সুন্নত ১১ রাকাত তাহাজ্জুদ।

এর বাইরে যা পড়তেন তা নিয়মিত ছিল না।

প্রিয় নবীজির সমস্ত কর্মকান্ড ছিল এক ধরনের অদ্ভুত ভারসাম্য।

দায়িত্ব পূরণ, জীবনের প্রয়োজন, এবাদত, দ্বীনের দাওয়াত, পরিবারের দেখাশোনা, সাহাবীদের দেখভাল, আর নিজের খেয়াল সবকিছুর মধ্যেই তিনি অদ্ভুত রকমের সুন্দর ভাবে তাল রেখে চলতেন।

তিনি বলতেন: "তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার অতিথি, তোমার সন্তানের, তোমার বন্ধুবান্ধবের কাছে"

সুবাহানাল্লাহ! কতইনা সুবিন্যাস্ত ছিল উনার জীবন মোবারক! স্বতস্ফূর্ত, সাদাসিধা, আবার একঘেয়ে নয়, যেকোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল সেখানে, ছিল না কোনো বিশৃঙ্খলা, কাঠিন্য বা নিরানন্দ।

হাসিখুশি আনন্দ-বিনোদনেরও অবকাশ ছিল উনার জীবনে। এতটা দিলখোলা মানুষ ছিলেন বলেই সাহাবীদের সাথে উনার গড়ে উঠেছিল হৃদয়ের বন্ধন।

মুখে সবসময় লেগে থাকত মুক্তোদানার মত জ্বল জ্বল করা হাসি।

এভাবেই তার চারপাশের মানুষদেরকে নিয়ে তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম সুখী মানুষ। সবার হৃদয়ের মণি।

শুধুই কি সাহাবারা? না বরং সমস্ত উম্মতের হৃদয়ের মণিকোঠায় রয়েছে তার অবস্থান। উনার সমস্ত কর্মকান্ড অনুসরণের মাধ্যমেই বেঁচে থাকবেন কেয়ামত পর্যন্ত উম্মাতের মাঝে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

(বি:দ্র: প্রিয় নবীজির এত্তো সুবিশাল জীবন ধারাকে দুই লাইনে কলমের আগায় তুলে ধরার ধৃষ্টতা আমার নেই।

শুধুমাত্র ভাবনার জগতে পাঠকদেরকে কিছুক্ষণের জন্য প্রিয় নবীজীর সাথে দিনাতিপাত করার উদ্দেশ্যেই আমার এই নগণ্য প্রয়াস।

হতে পারে এখান থেকে একটা সুন্নাহ কোন একজন পাঠক গ্রহণ করবে, আঁকড়ে ধরবে, বাস্তবায়ন করবে তার জীবনে।

সদকায়ে জারিয়া হবে আমার জীবনে। ইহজীবনে এবং পরজীবনে।

নসীব হবে সেই দুর্যোগময় কিয়ামতের মাঠে প্রিয় নবীজির সাফাআত!!

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুক

প্রবন্ধ

তিনি আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.)

নেকনুর আরা রিমা
সাবেক শিক্ষিকা, Rose Bird KIndergarten School, Tejgon.

"ওমর! কতটা ভালবাসো আমায়?" কাঁধে হাত রেখে কেউ একজন প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন ওমর (রা.) দিকে।" নিজ আর পরিজনের পর আপনাকেই আমি বেশী ভালোবাসি।" নাহ, তুমি খাঁটি মুমিন হওনি! তিনি ওমরকে জড়িয়ে ধরে আলতো চাপ দিলেন, এখন? নিজের পর আপনাকেই বেশী ভালোবাসি। "উহুঁ! এখনো পূর্ণ মুমিন হওনি," বলে আবারও বুকের সাথে ওমরকে জড়িয়ে নিলেন। এখন? ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনাকে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসি!" হ্যা, এখন! হে ওমর এখন তুমি পূর্ণ মুমিন হলে। জেনে রেখো! যতক্ষণ তোমাদের কারো কাছে পিতা-মাতা, সন্তানাদি, মাল-সম্পদ, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর থেকে 'আমি' অধিক প্রিয় না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত সে (ব্যক্তি) পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"

কে তিনি? যাঁকে ভালোবাসার সম্পর্ক ঈমানের সাথে? কে তিনি? যাকে অনুসরণের সম্পর্ক 'রব' এর ভালোবাসার সাথে? কে তিনি? যিনি প্রিয় স্বয়ং বিশ্ব প্রভুর? তিনি আমার নবী, আমাদের নবী সৃষ্টির সেরা

প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.)।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে শুরু করে সংশয়বাদী কিংবা আজকের এই হলিউড প্রজন্মের মানুষের ধারণা, আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (সা.) এর জীবনটাও তাদের কল্পনার চোখে দেখা অতি কাল্পনিক হলিউড মুভির মতই ফেন্টাসিতে ভরা।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের রাসূল (সা.) জীবন কি আসলে অতিপ্রাকৃত গল্পের নায়কের মত ছিল?

না। কঠোর বাস্তবতার এই জীবনে আমাদের মতই তিনি অতি সাধারন একজন মানুষ ছিলেন। যিনি সন্তানের মৃত্যুতে কেঁদেছেন। স্ত্রীদের সাথে অভিমান করে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছেন। যিনি নিজের ছেঁড়া জামা নিজেই সেলাই করেছেন। দিনের পর দিন যার বাড়ির চুলায় আগুন জ্বলেনি। শুধু পানি আর খেজুর খেয়ে মাসের পর মাস চলে যেত। ক্ষুধার্ত সাহাবী এসে ক্ষুধার জ্বালায় নিজের পেটে বেঁধে রাখা পাথর দেখালে তিনি নিজের জামা তুলে দেখাতেন, তার পেটে এর চেয়ে বেশী পাথর বাঁধা। যিনি এক তরকারীর বেশী দিয়ে আহার করেননি। যার ঘর ছিল মাটির, বালিশ ছিল খেজুরের ছোবলা, আর বিছানা ছিল খেজুর পাতার মাদুর, যাতে শয়ন করলে তাঁর শরীর মোবারকে দাগ পড়ে যেত।

যার আগে পরের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার পরও দিনে শতবার তওবা করতেন।

যিনি মাঝরাতে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন। এ দাঁড়ানো এত দীর্ঘ হতো যে তাঁর দুই পা ফুলে যেত।

যখন রাসূল সা. এর স্ত্রী তাঁকে প্রশ্ন করতেন, "আপনার এত কষ্ট করার কী দরকার? আপনার তো আগে পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে।"

তিনি বিনয়ের সাথে জবাব দিতেন, "আমি কি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হবো না?"

যিনি ইসালামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাস্তার নিহত সঙ্গিদের মাথা কোলে নিয়ে অঝোরে কেঁদেছেন। যিনি নিজে কবরে নেমে তাদের কবরস্থ করেছেন। যিনি কিশোরী স্ত্রী (রা.) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছেন। মাঝরাতে তাঁর কবরের পাশে গিয়ে ডুকরে কেঁদেছেন।

তিনি আমাদের মতই একজন অতি সাধারণ মানুষ। বদরের প্রান্তরে যিনি অল্প কিছু আল্লাহর বান্দা নিয়ে আল্লাহরই হুকুমে বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়েছিলেন। যিনি তায়েফের প্রান্তরে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হয়েও আল্লাহর কাছে দুহাত উঠিয়ে দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! তারা অবুঝ। আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকলে এ সবের কিছুই আমি পরোয়া করি না।

তিনি আমাদের রাসূল (সা.) যিনি নিজের পিতামাতার জন্য দোআ করার অনুমতি পাননি। যিনি মৃত্যুর সময়ও চেতন-অবচেতন অবস্থায় বারবার আওড়িয়ে গেছেন..... উম্মতি.. উম্মতি... আমার উম্মতি...

তিনি সেই রাসূল যিনি খোদ অমুসলিমদের কাছেও আস্থার প্রতিক ছিলেন। অমুসলিম তার কাছেই বিচার ফয়সালা করার জন্য আসতো। কারণ তারা জানতো, মুহাম্মদ আর যাই হোক না কেন, অবিচার করবে না।

কারণ, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যে অধ্যায়ে তাঁর উত্তম চরিত্র ও সুমহান কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই। পারিবারিক জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তাঁর মহান চরিত্রের দৃষ্টান্ত বিরাজমান।

তিনি জ্বীন, ইনাসান তথা গোটা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন।

যার রব তাঁকে এই পৃথিবীর বুকে একেবারে একাকী করে দিয়েছিলেন।

যেন একমাত্র তিনি, তাঁর পবিত্র ভালবাসা আর মমতায় তাকে লালন-পালন করতে পারেন।

সুমহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের ছায়াতলে বেড়ে উঠা রাসূল (সা.) তাই কখনো শিরক এর ধোকার শিকার হননি। তারুন্যের সেই যাযাবর সময়টাতেও তিঁনি ছিলেন সব ধরনের অপকর্মের উর্ধ্বে!

তাই তার চরিত্রে মক্কাবাসী এতটাই মুগ্ধ ছিল, তাঁর বিশ্বস্থতায় সবার এত আস্থা ছিল যে তারা তাকে নাম ধরে না ডেকে আল- আমিন (বিশ্বাসী ব্যাক্তি) বলে ডাকতো।

বহু বছর পর, যখন তিনি সত্যের পথে আহবান করা শুরু করে দিয়েছিলেন তখন সমস্ত মক্কাবাসী, তার আত্মীয়-পরিজন পর্যন্ত বিরোধিতা শুরু করে দিল, এমনকি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল, সেই পরিকল্পনাকরীদের ধন সম্পদও আমাদের প্রিয় রাসুলের ঘরেই নিরাপদ ছিল!

তারা যখন রাসূল (সা.) কে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘরে এসে দেখলো তিনি নেই, তার বদলে আলী (রা.) আছেন! আলী (রা.) বললেন, মুহাম্মদ (সা.) আমাকে এখানে রেখে গেছেন, যেন তোমাদের যার যার সম্পদ তাকে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ যে ব্যক্তিটি তাকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল তার বিবেচনায়ও তার মাল সম্পদ নিরাপদে রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা ছিল আমাদের রাসুলের ঘর। (সুবহানাল্লাহ্)।

এমনই ছিলেন আমাদের রাসূল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত: EIIN-138600

আবাসিক
অনাবাসিক
সারাদিনের স্কুল

বাংলা মাধ্যম: নাসারি থেকে দশম শ্রেণি (বিজ্ঞান ও ব্যাবসায় শিক্ষা)

ইডেন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

English Medium: Nursery to Class Five

EDEN ENGLISH SCHOOL

ইডেন সিটি, সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন স্কুলের সামনে, সরাইপাড়া
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। ফোন: 09638 776677, 0161 33 55 160

রাসূল অবমাননার শাস্তি

আবু জোবায়ের
শিক্ষার্থী, হাটহাজারী মদ্রাসা

ইসলাম হল নিখুঁত, পরিপূর্ণ ও চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা। এর প্রতিটি বিধান ও আহকাম সত্য ও যুক্তিযুক্ত। ইসলামে কোনো দ্বিধা ও জটিলতা এবং অসারতা ও অযৌক্তিকতা নেই। ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইসলামী জীবনের প্রশান্তি ও প্রাণময়তা প্রমাণিত সত্য। সারা বিশ্বের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে আপন করে নিচ্ছে। দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।

ইসলামের অগ্রযাত্রা পশ্চিমা ও তার দোসরদের সহ্য হয় না। তাদের গাত্রদাহ হয়। বিগত কয়েক বছর থেকেই তারা পুরো দুনিয়ায় ইসলাম অবমাননার এক তুফান বইয়ে দিয়েছে। তারা চেষ্টা করছে ইসলামকে হীন ও নিচু করার। ইসলাম ও ইসলামের নবীর 'খুলুকে আজীমের' উপর কালিমা লেপনের। আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আপত্তিকর কথা প্রচারের।

শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানীর ভাষায় "বর্তমানের তথাকথিত সভ্যতার দাবিদাররা, যারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঢাকঢোল পিটিয়ে বলে বেড়ায়, আমরাই মানবাধিকারের ঝান্ডাবাহী। তাদের কাছেও ইসলামের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে তাদের করুণ পরাজয় হয়েছে। ফলে তাদের জন্য এখন ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে গালিগালাজ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। তাই চাঁদের গায়ে থুথু ছুঁড়লে যেই পরিণতি হয়, তাদের তাই হচ্ছে। নিজেদের নাপাক থুথুতে সর্বগতরে নিজেরাই নাপাক হচ্ছে"।

শানে রিসালাত সম্পর্কে গোস্তাখি এত ভয়াবহ ও ঘৃণ্য অপরাধ যে, কোন মুসলমান-ই তা বরদাশত করতে পারেনা। মুসলমানরা যত দুর্বল, সহায়-সম্বলহীন ও বিপর্যস্তই হোক না কেন যখন হেফাজতে শানে রেসালতের প্রশ্ন আসে তখন শাপলার তপ্ত-খুন ইশকে রাসুলের চেতনায় ও শিরা-উপশিরায় টগবগ করে উঠে। অপরিণামদর্শী সে নরপশুকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত তারা স্থির ও শান্ত হতে পারে না।

রাসূল অবমাননাকারীদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন-

انّما جزاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে দুশমনিতে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির পাঁয়তারা করে, তাদের শাস্তি কেবল মৃত্যুদন্ড, শূলিবিদ্ধ করে হত্যা কিংবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা অথবা নির্বাসিত করা (কারাগারে নিক্ষেপ করা)। এ তো হল তাদের পার্থিব অপমান। আর পরকালেও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (মায়েদা ৬ : ৩৩)

হাদীসে নববীতে মুরতাদদের শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

عن عكرمة قال : أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله ﷺ : لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ : من بدل دينه فاقتلوه.

ইকরিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা.) এর নিকট কয়েকজন মুরতাদ-যিন্দীককে ধরে আনা হল। তিনি তাদের পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এ-খবর ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে পুড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ পাকের শাস্তি দানের বসত (আগুন) দ্বারা শাস্তি দিও না।' আমি বরং এদেরকে হত্যা করতাম। কেননা আল্লাহর রাসুল বলেছেন, 'যে নিজের দ্বীন পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করে ফেলবে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৯২২, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৫১, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৮৭১)

এছাড়াও হাদীস শরীফে কা'ব ইবনে আশরাফ হত্যার প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুতার ঘোষণা দেওয়া ও তাঁর শানে কুৎসা রটনা করে কবিতা আবৃত্তির অপরাধে

তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮১১ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮০১)

ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. লিখেছেন-

সব ধরনের মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা মতৈক্য রয়েছে। হযরত আবু বকর, উসমান, আলী, মুআয, আবু মুসা, ইবনে আব্বাস এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ প্রমুখ সাহাবী (রা.) থেকে এ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ শাস্তির উপর কোনো সাহাবী আপত্তি করেননি। অতএব মৃত্যুদন্ডের এ বিধানের উপর সাহাবায়ে কেরামেরও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।-আলমুগনী ১২ : ২৬৪

"যে দোষ-ত্রুটি মুক্ত বন্ধু খুঁজবে তাকে একাই থাকতে হবে। যে ঘাটতিহীন স্ত্রী পাওয়ার আশা করবে তাকে অবিবাহিত থাকতে হবে। আর যে সমস্যাহীন প্রেমিক খুঁজবে তাকে অনুসন্ধানকারী হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। আর যে পরিপূর্ণ আত্মীয় খুঁজবে তাকে আত্মীয়হীন পরিবেশে থাকতে হবে"।

রাসুলের কটুক্তিকারীর মৃত্যুদন্ডের ব্যাপারে উম্মাহর ঐক্যমত নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক। চার ইমাম থেকেই এই ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল খারাজ, ১৮২; ফতোয়ায়ে শামী ৩/৩১৯)

কুরআন হাদীস ও ইজমা দ্বারা রাসূল অবমাননার শাস্তি প্রমাণিত হলো। বিশ্বাসীদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু রাসূল অবমাননার শাস্তি হিসেবে যখনি মৃত্যুদন্ডের কথা আসে, তখন পশ্চিমা জ্ঞানপাপী ও তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। তারা বরং মানবতার মুক্তির দূত রাসূল (স.) এর অবমাননাকেই একটি মানবিক অধিকার হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চালায়।

যে মহান সত্তা মানব জাতিকে মানবতা ও মানবতার সম্মান শিখিয়েছেন; মানব জাতিকে সম্মানের অধিকার দিয়েছেন, তার সাথে বেয়াদবির শাস্তি মৃত্যুদন্ড কখনো মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও কোন আইনে এই মানদন্ড টিকতে পারেনা। কারণ, পৃথিবীর সব দেশেই, সব রাষ্ট্রেই যখন বিদ্রোহীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়; তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের বিদ্রোহীকে কেন মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবেনা!

দাওরায়ে হাদিস এবং দাখিল ও আলিম বিজ্ঞান বিভাগ সমৃদ্ধ একটি মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আবাসিক | অনাবাসিক | ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

- নার্সারি - কামিল (পৃথক বালিকা শাখা)
- নার্সারি - আলিম (পৃথক বালক শাখা)
- মিশকাত ও দাওরায়ে হাদিস (শুধু ছাত্রী)
- হিফজখানা (বালক ও বালিকা পৃথক)
- সহিহ কুরআন শিক্ষা বিভাগ (২ টা - ৪ টা)

- সহিহ আকিদা, ইবাদাত, পর্দা, আমল-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।
- ক্লাসের বিষয়ের পাশাপাশি সহিহ কুরআন, নাহু-সরফ, আরবি ও ইংরেজি ভাষা চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- লেখাপড়ার পাশাপাশি কম্পিউটার, রান্নাবান্না, সেলাই, বিবিধ হাতের কাজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ।

কঠোর নিরাপত্তা, বিশ্বস্থ অভিভাবকত্বের নিশ্চয়তাসহ ছাত্র ও ছাত্রী পৃথক মানসম্পন্ন হোস্টেল ব্যবস্থা।
শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ৩টি মাইক্রোবাস ও ১টি টেম্পুসহ ৪টি নিজস্ব পরিবহণ।

১ আলিম পরীক্ষা দিয়ে / কাওমি মাদরাসা থেকে সরাসরি মিশকাত বা দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি করা হয়।

হিফজুল কুরআনের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও গণিত ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা হয়।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী/বয়স্ক মহিলারাও সহিহ কুরআন ও নামাজ শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
মীর মুহাম্মদ ইউসুফ ছানুভী
খতিব: সরকারি হাজি মহাম্মদ মহসিন কলেজ জামে মসজিদ
মহাসচিব: চট্টগ্রাম প্রাইভেট মাদরাসা এসোসিয়েশন
মোবাইল : ০১৮১৬ - ৩২০ ৭৬৮, ০১৯৭৬ - ৩২০ ৭৬৮
বিকাশ : ০১৮৩৯ - ৯৮০ ১৮১, অফিস : ০১৮১৮ - ৯১১ ৬৭৫

আইডিয়াল গার্লস মাদরাসা
আইডিয়াল বয়েজ মাদরাসা ● বালক ও বালিকা হিফজখানা
খাজারোড (বহদ্দারহাটের পূর্বে চৌধুরী স্কুলের পশ্চিমে), চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। Email : idealgirlsfm@gmail.com
Visit us Website www.idealgirlsfm.edu.bd facebook Mir Mohammad Yousuf Sanowi ● Ideal Girls Madrasah

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী
প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

মানব জাতির শুরুতে পৃথিবীতে যে মানুষকে জান্নাত থেকে (ভিন্ন গ্রহ) প্রথম পাঠানো হয়েছে তিনি হচ্ছেন সকলের আদি পিতা প্রথম নবী হযরত আদম (আ)। মানব জাতির যাত্রা শুরুতে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন রকম শিক্ষাঙ্গন তথা স্কুল, কলেজ বা পাঠশালা তখনও পৃথিবীতে হয়নি। তাই আদম (আ:) এর জ্ঞানের ভান্ডার আল্লাহ প্রদত্ত। জান্নাতে আল্লাহর নির্দেশে আদমের (আ) জ্ঞানের সামনে ফেরেশতারা নত হয়েছেন। আর শেষ নবী হচ্ছেন আরবের বুকে জন্মগ্রহণকারী উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। সমকালীন মক্তব, মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি। আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর শিক্ষক। দীর্ঘ ২৩ বছর সময়কালে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী বাণী তথা ওহীর মাধ্যমে পেয়েছেন মহাবিজ্ঞানময় এক গ্রন্থ আল কোরআন। যার সমতুল্য কোনো পুস্তক পৃথিবীতে নেই। যার মধ্যে সম্প্রতি আবিস্কৃত বিজ্ঞানের অনেক সূত্রের উপস্থিতি চিন্তাশীল মানুষকে হতবাক করে দেয় এবং অবনত মস্তকে এক মহাশক্তিধর আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করে। সেই কিতাবের প্রথম বাণী হচ্ছে "পড়"।

কোনো কিছু না পড়ে, না বুঝে মনগড়া পূর্ব ধারণার (তথা হিংসার) বশবর্তী হয়ে যারা অন্যকে দোষারোপ করেন তারা আর যাই হোন, সত্যিকার অর্থে আলোকিত জ্ঞানবান মানুষ নন। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সকল শাখায় মধ্যযুগের আবিষ্কার তথা গবেষকদের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তারা বলতে চায়, মধ্যযুগ বৈজ্ঞানিকভাবে Sterile। প্রাচীন সভ্যতাসমূহ যথা মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, পারসিয়ান, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের মাঝখানে একটা গ্যাপ দেখা যায় যাকে 'অন্ধকার যুগ' (The dark ages) বলা হয়ে থাকে। ঐসময় জ্ঞানের আলোক শিখা যারা ধারণ করেছিলেন তারা পশ্চিমা নন, তারা হলেন অন্য সংস্কৃতির একদল মানুষ যারা মুসলিম নামে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দী থেকে ১৩তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধকার সময় (The dark ages) হিসাবে ইতিহাসে স্বীকৃত। ঐ সময় হলো আরব বিশ্ব তথা ইসলামী সাম্রাজ্য বিকাশের ঘটনাবলিতে ভরপুর। সে সময় বিজ্ঞান ছিল মধ্য-দুপুরের উজ্জ্বল তেজস্বী সূর্য কিরণের মত দেদীপ্যমান। ঐ সময়টাকে অযৌক্তিকভাবে, অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেন তখনকার সময় কিছুই ঘটেনি। এটা হলো মহা তথ্যসন্ত্রাস। আর এ সন্ত্রাসের জনক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী আজকের বিশ্বের তথাকথিত আলোকিত মানুষেরাই। এ প্রবন্ধে আজকের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে তার সামান্য কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মধ্যযুগ কি অন্ধকার যুগ?

সত্যিকার অর্থে মধ্যযুগ বৈজ্ঞানিক হিসাবে কোনোভাবে স্টিরাইল বা আনপ্রোডাক্টিভ নয়। এই সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের (৭৫০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দ) হাতে বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ সাধন হয়েছে তার কাছে আজকের বিজ্ঞান তথা সভ্যতার অগ্রগতি বহুলাংশে ঋণী। ঐ সময় যদি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন না হতো, তাহলে আজকের পৃথিবী এতদূর এগুতে পারত না। বরং হাজার বছর পিছিয়ে থাকত। এখানে সপ্তম শতাব্দী থেকে ১৪তম শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানের একটি ধারাবাহিক আংশিক তালিকা দেওয়া হলো (সারণী ১-৩)। পনের শতাব্দীর পরেও বৃহত্তর মুসলিম অবদান চলতে থাকে।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বিষয়ে অবদানসহ সময়কাল অনুযায়ী তথ্যাবলীর আংশিক চিত্র

সারণী-১

বিজ্ঞানীর নাম	বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান	সময়কাল (খ্রি.)
Jabir Ibn Haiyan(Geber)	Chemistry (Father of Chemistry)	Died- 803 CE
Al-Asmai	Zoology, Botany, Animal Husbandary	740-840
Al-Khwarizmi (Algorizm)	Mathematics, Astronomy, Geography, (Algorithm, Algebra, Calculus)	770-840
Amr Ibn Bahr (Al-Jahiz)	Zoology, Arabic Grammer, Rhetoric Lexicography	776-868
Ibn Ishaq Al-Kindi (Al-Kindus)	Physics, Optics, Medicine, Mathematics, Metallurgy, Philosophy	800-873
Thabit Ibn Qurrah (Thebit)	Astronomy, Mechanics, Geometry, Anatomy	836-901
Abbas Ibn Firnas	Mechanics of Flight, Planetarium, Artificial Crystals	Died-888
Ali Ibn Rabban Al-Tabari	Medicine, Mathematics, Caligraphy, Literature	838-870
Al-Battani (Al bategnius)	Astronomy, Mathematics, Trigonomety	858-929
Al-Farghani (Al-Fraganus)	Astronomy, Civil Engineering	C. 860
Al-Razi(Rhazes)	Medicine, Opthalmology, Smallpox, Chemistry, Astronomy	864-9302
Al-Farabi (Al-Pharabius)	Music, Sociology, Logic, Philosophy, Political Science	870-950
Abul Hasan Ali Al- Masudi	Geography, History	Died-957
Al-Sufi (Azophi)	Astronomy	903-986
Abu Al-Qasim Al-Zahravi (Al-bucasis)	Surgery, Medicine, (Father of Modern Surgery)	936-1013
Muhammad Al-Buzjani	Mathematics, Astronomy, Geometry, Trigonometry	940-997
Ibn Al-Haitham (Al-Hazen)	Physics, Optics, Mathematics	965-1040
Abu Raihan Al-Biruni	Astronomy, Mathematics (Determined Earth's Circumference)	973-1048
Ibn Sina(Avicenna)	Medicine, Mathematics, Astronomy, Philosophy	981-1037
Al-Zaraqali (Arzachel)	Astronomy, (Invented Astrolabe)	1028-1087
Omar Al-Khayyam	Mathematics, Poetry	1044-1123
Al-Ghazali (Algazel)	Sociology, Theology, Philosophy	1058-1111

সারণী-২

বিজ্ঞানীর নাম	বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান	সময়কাল (খ্রি.)
Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya (Ibn Bajjah)	Medicine, Mathematics, Astronomy, Music, Poetry	1106-1138
Ibn Zuhr (Avenzoar)	Surgery, Medicine	1091-1161
Al-Idrisi (Dreses)	Geography (World Map, First Globe)	1099-1166
Ibn-Tufayl Abdubacer	Medicine, Philosophy, Poetry	1110-1185
Ibn-Rushd (Averroes)	Medicine, Astronomy, Philosophy, Law, Theology	1128-1198
Al-Bitruji (Alpetragius)	Astronomy	Died-1204

সারণী-৩

বিজ্ঞানীর নাম	বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান	সময়কাল (খ্রি.)
Ibn Al-Baitar	Pharmacy, Botany	Died-1248
Nayir Al-Din Al-Tusi	Astronomy, Non-Euclidean Geometry	1201-1274
Jalal Al-Din Rumi	Sociology	1207-1273
Ibn Al-Nafis Damishqui	Anatomy	1213-1288
Al-Fida (Abdul Feda)	Astronomy, Geography, History	1273-1331
Muhammad Ibn Abdullah (Ibn Battuta)	World Traveller, 75000 mile Voyage, From Morocco to China to Back	1304-1369
Ibn-Khaldun	Philosophy, Sociology, Philosophy of History	1332-1395
Ulugh Beg	Astronomy	1393-1449

মুসলমানদের উপর ৩টি ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতা, সহায় সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর উপর ক্রুসেডারগণ সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

প্রথম ধ্বংসযজ্ঞ

প্রায় শতাধিক বছর ধরে মুসলিম সম্পদ, জীবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মৌলিক অবকাঠামো সমূহের উপর প্রথম ধ্বংসযজ্ঞের ঢেউ প্রবাহিত হয়। সংগঠিত হয় অসংখ্য ক্রুসেড। Toledo (1085), Corsica, Malta (1090), Provence (1050), Sicily (1091) এবং Jerosalem (1099) সহ অনেক মুসলিম অঞ্চলের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় ধ্বংসযজ্ঞ

১১২ বছরের অধিককাল ধরে চলে দ্বিতীয় ধ্বংসযজ্ঞ। ধ্বংস হয় মুসলিম সম্পদ, মালামাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো। এর শুরু হয় অনধিকার ক্রুসেডার আক্রমণ (১২১৭-১২৯১) দিয়ে এবং মঙ্গোল ইনভেশনের (১২১৯-১৩২৯) মধ্য দিয়ে এর শেষ হয়। ক্রুসেডাররা জেরুজালেম থেকে সমগ্র মেডিটেরিয়ান অঞ্চল এবং পশ্চিমে মুসলিম স্পেন পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ফল স্বরূপ মুসলিম কর্ডোভা (১২৩৬), ভেলেনসিয়া (১২৩৮) এবং সিভিলীর (১২৪৮) পতন ঘটে। মঙ্গোলদের ধ্বংসযজ্ঞে একেবারে পূর্বের মুসলিম ফ্রন্টিয়ার, কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিম এশিয়া, ভারত ও পারস্য হতে আরব মালভূমি পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতন ঘটে এবং শেষ হয় আব্বাসীয় খেলাফত। বাগদাদেই হত্যা করা হয় ২০ লক্ষ মুসলিম। এমনকি মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রভূমিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার এবং অবকাঠামো সমূহ সমূলে ধ্বংস করা হয় ঐ সময়ে।

তৃতীয় ধ্বংসযজ্ঞ

মুসলিম সম্পদ, মালামাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠা এবং অবকাঠামোর উপর ধ্বংসযজ্ঞের তৃতীয় ঢেউ যখন আঘাত হানে তখন স্পেনে (১৪৯২) মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। গ্রানাডার Vivarrambla-র পাবলিক স্কোয়ারে পোড়ানো হয় দীর্ঘদিনের তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি ভলিউমে লেখা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির বই। সাথে সাথে উপনিবেশকরণ

শুরু হয় আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকায়। এখন চিন্তা করুন জঙ্গী তথা terrorist কারা এবং কত ভয়ংকর তাদের আচরণ। মুসলমানদের জঙ্গী বানিয়ে মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে। মগজ ধোলাই করা হচ্ছে অনবরত, তাদের জঙ্গীপনার ইতিহাস সীল করে দিয়ে। এ হল মহা তথ্য সন্ত্রাস, মিথ্যার বেসাতি।

মুসলিম ও অমুসলিমদের দেশ বিজয়: সংরক্ষণ বনাম ধ্বংসযজ্ঞ

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্মের ৬৩ বছর পর অর্থাৎ ৬৩২ সালে উনার ওফাত হয়। ৬৩ বছরের জীবনে শেষের ২৩ বছর ধরে তিনি ইসলাম প্রচার ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অশিক্ষিত, মূর্খ ও হিংস্র আরবদের দীর্ঘদিনের হানাহানি, গোত্রে গোত্রে মারামারি বন্ধ করে তাদেরকে একত্রিত করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের মাঝে এক উলেখযোগ্য শক্তিশালী মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারই সাক্ষ্য বহন করে সেই সময়ের দু'টি নাম করা সাম্রাজ্য পার্সিয়ান এবং বাইজান্টাইন জয়। একজন মানুষের জীবদ্দশায় ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে পূর্বে চীনের সীমানা পর্যন্ত।

নবীজীর মৃত্যুর মাত্র ৮০ বছরের মাথায় আরবরা ইউরোপ অতিক্রম করে স্পেন পৌঁছে। সেখানে ৭'শ বছর মুসলিম শাসন টিকে ছিল। ৮৩১ সালে মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকার সিসিলি জয় করে এবং ২০০ বছর শাসন করে। ৮৪৬ সালে মুসলমানরা ইটালির দক্ষিণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। দশম শতাব্দীতে ইটালি এবং স্পেনের পরে আরবরা মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত গমন করে। ইটালির দক্ষিণাঞ্চল এবং সিসিলিতে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে তোলা হয়। ইটালির দক্ষিণাঞ্চলে তারা প্রতিষ্ঠা করে সালেমো বিশ্ববিদ্যালয় (University of Solerno)। যার মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে জ্ঞানের আলো। যখন বাগদাদে তৈরি হয়েছে উন্নতমানের রাস্তাঘাট, শুরু হয়েছে পানি সরবরাহ, তৈরি হয়েছে হসপিটাল, গোসলখানা, রাস্তায় রাস্তায় লাইট জ্বলতো তখনও ইউরোপের লোকেরা কাঁচা রাস্তায় যাতায়াত করতো। ইসলাম যখন যে দেশে গিয়েছে, সংরক্ষণ করেছে সে দেশের সংস্কৃতি, উন্নত করেছে বিজ্ঞান গবেষণা এবং গ্রহণ করেছে ভালো জিনিসটা। মুসলিম বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে মানবজাতিকে দিয়েছে সুখময় শান্তি। বিশ্বের বুকে সহস্রাধিক বছর ধরে মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞান-গরিমায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই বিজয় এবং নেতৃত্বের মূলে রয়েছে চারটি কারণ:

১। শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া এবং সম্মান করা

মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের প্রথম বাণী হচ্ছে 'পড়'। হযরত মুহাম্মদ (সা) একজন বন্দি শত্রুকে মুক্তি দিতেন দশজন মুসলিমকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে। অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে নয়। আজকের তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার মার্কিনীদের চরম বন্দি নির্যাতনের আচরণ লক্ষ্যণীয়। পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে, "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা সমান নয়"। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে নবীজী মুহাম্মদ (সা) বললেন, "এক ঘণ্টার শিক্ষাদান এক রাত্রি প্রার্থনার চেয়ে উত্তম"। জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ, বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা এবং মানব উপকার মুসলমানদের বড় ইবাদত ছিল বলেই অল্প সময়ে কঠোর পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে মুসলমানরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব ও বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। নবীজী (সা) ও আল কোরআনের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বল্প সময়ে অসাধারণ প্রতিভা ও মানব কল্যাণে ভলিউমের পর ভলিউম তথা গবেষণা লব্ধ Experimental জ্ঞান বিতরণ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন মুসলমানেরা।

২। ধ্বংসযজ্ঞ বর্জনীয়

মহানবী (স:) মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করলেন- কোনো বাড়িঘর, প্রাণিকুল তথা গাছপালা ধ্বংস করা যাবে না। মুসলমানেরা যখন কোনো দেশ জয় করেছে নবীজীর সেই মহান বাণী তাঁরা আদেশ হিসাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মরণাস্ত্রসমূহ কীভাবে মানবকুলকে ধ্বংস করেছে তা ইতিহাস হয়ে আছে। এর ব্যবহারকারী কারা? নিশ্চয় মুসলমানরা নয়। আজকের দুনিয়ার নিরপরাধ মানুষের (শিশু ও বৃদ্ধ) জীবন এবং মানুষের সামান্য আশ্রয়, ফিলিস্তিনিদের উদ্বাস্তু শিবির, মায়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, হত্যা ও নারী নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে কারা? ইতিহাস সাক্ষী, তথাকথিত শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টিকারী ইহুদী ও মুশরিকরা। অতি সম্প্রতি (২০০৪ সালে) বাগদাদের বিখ্যাত মিউজিয়াম লুটপাট ও ইরাক ধ্বংস কারা করেছে তা বিশ্ববাসী জানে। ইঙ্গ-মার্কিনীরা নয় কি? আজকে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের মদদ দাতা কারা? আফগান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ধ্বংসের পিছনের কারা? সমকালীন ঘটনা ও ইতিহাসের পাতা উল্টালে তা বুঝা যায়।

৩। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা

ইসলাম তার অনুসারীদের শরীর এবং কাপড়-চোপড় ময়লামুক্ত এমনকি দাগবিহীন পরিষ্কার হয়ে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর কাছে যেতে বলে। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এর চেয়েও বড় কথা আর কী হতে পারে?

৪। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা

মুসলমানরা সত্যিকার খৃষ্টান এবং ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের কিতাবপ্রাপ্ত ভাই হিসাবে গণ্য করে। ইতিহাস বলে স্পেন বিজয়ী (৭১১ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলমানেরা ধর্মীয় উন্মাদনায় উগ্র ছিল না। তাঁরা তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন এবং অন্যদের বিশ্বাস পালন করতে দেয়ার ক্ষেত্রে উদার ছিলেন : তারা সমকালীন স্পেনের সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে লালন করেছেন, হোক তা ইহুদী বা অন্য ধর্মের। যার কারণে তা বিশ্বের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিরাট কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

মুসলমানেরা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তথা বিজ্ঞানীদের কর্মকান্ডকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তার প্রমাণ হলো তারা দেশ বিজয়ের পর গ্রীক জ্ঞানী পন্ডিতগণের লেখাকে আরবিতে অনুবাদ করেন। আরবি হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ভাষা। বাগদাদ বিজ্ঞানময় বিশ্বের রাজধানীতে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণায় মুসলমানেরা হলেন মহান আলো বহনকারী। মুসলমান বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের উৎসকে ইউরোপের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। Campbell বলেন, "ইউরোপীয় মেডিকেল পদ্ধতি আরবদের। শুধু উৎপত্তির দিক দিয়ে নয়, গঠন কাঠামোর দিক থেকেও। আরবরা ইউরোপীয়দের বুদ্ধিদানকারী অগ্রপুরুষ। ইউরোপ থেকে বিজ্ঞান চলে যায় আমেরিকানদের হাতে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা চলছে এভাবে।

উপসংহার

মানবতার উন্নয়নে মুসলিম বিজ্ঞানীরা যা করেছেন তা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। অতীতের পাওয়া জ্ঞানকে তারা সংরক্ষণ করেছেন এবং নতুন নতুন তথ্য ও অবিষ্কার যোগ করেছেন। তারা সভ্যতার মশালকে সুচারুরূপে লালন করেছেন এবং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছেন। আজকের ইউরোপ এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তার মূল ভিত্তি মুসলিম বিজ্ঞানীদের গড়া। ইসলামী নেতৃত্ব ও ঐক্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমদের বিজ্ঞান গবেষণায় যত্নবান হওয়া দরকার। একে ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করে পুনরায় বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে। তাহলে সন্ত্রাসের নামে যে মুসলিম দমন ও নিধন প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য চালিয়ে যাচ্ছে তা একদিন প্রতিহত হবেই ইনশাআল্লাহ। আমরা সে দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

তথ্যপঞ্জি:

1. Zohoor, A and Haq, Z. 1997. Quotations from famous Historians of Science. Full Article in the E-book.
2. George Sarton, 1950-53. Introduction to the History of Science, Vol. I-IV Carnegie Institute of Washington, Baltimore, 1927-31, Williams and Wilkins, Baltimore 1950-53.
3. Arnold, T and Guillaume 1931.The legacy of Islam. Oxford Clarendon Press.
4. Gibbon, E. 1990; The History of the Decline and Fall of Roman Empire, London.

বরেণ্য আরবী-বাংলা সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষক আল্লামা আবু তাহের সাহেব দা. বা. কর্তৃক প্রণীত

সর্বজন স্বীকৃত সাড়া জাগানো মাদানী নেসাব এখন চট্টগ্রামে!!

চট্টগ্রামে মাদানী নেসাবের পরিপূর্ণ অনুসরণে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান...

তা'লীমুল উম্মাহ গার্লস মাদরাসা চট্টগ্রাম

● নূরানী বিভাগ (প্লে থেকে ৪র্থ শ্রেণি) ● হিফজ বিভাগ ● নাযেরা বিভাগ

আবাসিক অনাবাসিক ¦ সারাদিন

※ সিসি ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

ভর্তির তারিখ : প্রতি বছর
১ম পর্ব : ১০-২০ শাওয়াল
২য় পর্ব : ২০ ডিসেম্বর - ৫ জানুয়ারী

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ আ/এ, প্লট-ডি, এক কিলোমিটার
বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের নিকটে, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
০১৮৩১ ৫৪১৩৫৪ (অফিস), ০১৮৬৫ ০২০৭৭৭ (পরিচালক)
talimulummah@gmail.com
www.tucmc.com

প্লে হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদেরও ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

সীরাতুন নবী সা.

যুগে যুগে শত মহাপুরুষ মানব সভ্যতার মুক্তির জন্য বহুমাত্রিক পথ একে গেছেন। অথচ বাস্তবতা এই যে, কোনটাই মুক্তি দিবে তো দূরের কথা, মুক্তির স্বপ্নটুকু দেখাতেও ব্যর্থ হয়েছে। সেই পথহারা মানব সভ্যতার পথের দিশা দিতে, জাহিলিয়াত থেকে কাটিয়ে উঠতে আল্লাহ তা'আলা সহস্র নবী আ. পাঠিয়েছেন। সেই ধারাকে সমাপ্ত করতে ধুলির ধরায় আলো ছড়ালেন, মরুর বুকে ফুল ফুটালেন ইনসানিয়াতের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ (সা.) যার আনীত শারীয়াত মুক্তি অন্বেষা মানুষের হেদায়াতের মশাল হিসাবে চির অম্লান। তিনি বাস্তবতায় দেখিয়ে গেছেন, মানব সভ্যতার মুক্তির চূড়ান্ত ঠিকানা "ইসলামী সভ্যতা"।

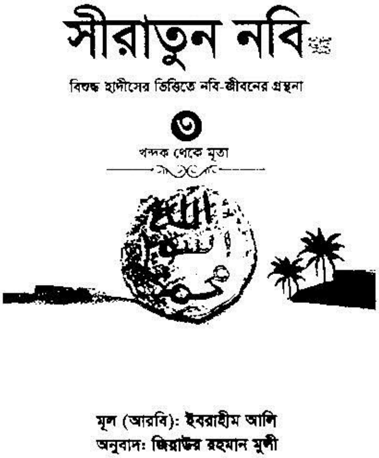

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মঙ্গোলিয়ানদের হাতে মুসলিম সাম্রাজ্য তছনছ হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, মহীরূপী দ্বীন তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের পরিমন্ডল থেকে ছিটকে পরে, ব্যক্তি জীবনে ক্ষুদ্র পরিসরে বেচে থাকে। ঠিক সেই সময়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম জাওযিয়্যা, হাফেজ ইবনে কাছির, ইমাম যাহাবী আলাইহির রাহমাহ সহ কিছু নিবেদিতপ্রাণ সুন্নাতে উদ্ভাসিত একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য মুসলিম উম্মাহকে আবার পুনর্জাগরণ করেছেন।

এখানেই শেষ নয় !

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আকারে। এবারের আঘাতে মুসলিমদের ঘরবাড়ি ভৌতিক কাঠামো ততোটা ক্ষতিগ্রস্থ না হলেও, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে ইসলামের স্বকীয়তা একেবারে ম্লান হয়ে পড়ে। প্রথমে ব্যক্তিজীবনে ঠাই মিললেও ধীরে ধীরে গনমানুষ ব্যক্তিজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলাম কাল মাত্র একটা ধর্ম/দর্শন। সময়ের আবর্তনে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিধিতে সৃষ্ট শূন্যতায় তড়িগড়ি করে জায়গা করে নেয় জাহিলিয়াত। সেই জাহিলিয়াত আজও চলমান, ভয়ংকর রূপে দৃশ্যমান।

একুশ শতকের জাহিলিয়াতকে মোকাবেলা করতে হলে হেরার আলোর প্রদীপ্ত শিখার বিকল্প নাই। জাহিলিয়াতে ভরপুর একটি সমাজে ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবন আচরনই সর্বোচ্চ আদর্শ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

"আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্খী এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে?"

রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরো জীবনটাই শারীয়াহ বাস্তব নমুনা, যাকে এক কথায় সিরাহ/সিয়ার/সিরাত (জীবন চরিত্র) বলতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যে জাহিলিয়াত মোকাবিলা করতে হয়েছে, বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান যুগে জাহিলিয়াতের অমানিশা কাটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সীরাতের প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীন।

প্রিয় বন্ধুরা,
সিরাত কেন পড়বো?
আদর্শ জীবন গঠনের প্রযোজ্য ভুমিকা হচ্ছেঃ-

- ইলম/জ্ঞান (আলো)
- মডেল (রাস্তা)

জীবন চলতে রাস্তার প্রয়োজন, রাস্তা চলতে আলোর প্রয়োজন। একটি আরেকটির পরিপূরক। আর এই দুটির উত্তরাধিকারী কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)।

তিনি নিজেই বলছেন, أدبني ربي فأحسن تأديبي

অর্থাৎ, আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি কত সুন্দর করেই না আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ইলম হচ্ছে "আল কুরআন"। কুরআন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে পজিটিভ গ্রন্থ। এটা মানবজাতির প্রতি আহবান, দয়া ও জ্ঞানের ঝর্ণাধারা, পথ হারাদের জন্য পথনির্দেশ, অস্বীকার কারীদের জন্য সতর্কবানী, সন্দেহকারীদের জন্য নিশ্চয়তা, দুঃখীদের জন্য সান্তনা, হতাশাগ্রস্থদের জন্য আশারবানী। আর সেই মহিমান্বিত কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যাকারী রাসূলুলাহ সা.।

বাস্তব জীবনে ইমান, ইসলাম, আখলাক, মুয়ামালাত, ইহসানের পূর্ণাঙ্গতা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)'র মাঝেই মিলবে। আল্লাহর নির্দেশ ও ভালোবাসা পেতে, কুরআনকে বুঝতে, মানতে এবং পৌছাতে, আখলাকের মজবুতি গড়তে এবং জাহান্নাম থেকে বাচতে রাসূল (সা.) উত্তম ও জীবন্ত মডেল। আর এসব খুজে পাই সিরাত বিশ্লেষণে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

সীরাত গ্রন্থ বলেই রাহীকুম মাখতুম, সীরাত বিশ্বকোষ, সীরাতে সারওয়ারে আলম সহ অসংখ্য বইয়ের নাম মাথায় চলে আসে কিন্তু আজকে একটা গবেষনাধর্মী সীরাত গ্রন্থকে পরিচয় করিয়ে দিবো।

মূল গ্রন্থ : সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ (সা.)
অনুবাদ গ্রন্থ :সীরাতুন নবি (সা.) (১ম-৪র্থ খন্ড)
মূল লেখক (আরবি) : ইবরাহীম মুহাম্মদ আলি
অনুবাদ: জিয়াউর রহমান মুন্সী
প্রাপ্তিস্থান:মাকতাবাতুল বায়ান, দোকান নং # ৩১৫, ৩য় তলা, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭০০৭৪৩৪৬৪
অনলাইন পরিবেশক: রকমারি.কম
ফেসবুক: মাকতাবাতুল বায়ান।

প্রিয় পাঠক!
কেন এই বইটি আলোচনায়,
সীরাতুন নবির উৎস চারটি-

- আল কুরআনুল কারীম
- হাদীসের গ্রন্থাবলি ও তৎসংশিষ্ট রচনাসমগ্র
- মাগাযী ও সিয়ার (যুদ্ধবিগ্রহ ও জীবনচরিত), দালাইল (নবুওয়াতের প্রমাণাদি) ও শামায়েল (রাসূলুল্লাহ সা বৈশিষ্ট্য) সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি।
- ভাষা, সাহিত্য ও কবিতার গ্রন্থরাজি

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো: শেষে দুইটা উৎসের উপর ভিত্তি করে বহু বই বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু না আছে কুরআনের, না আছে হাদিসের ভিত্তিতে সিরাত রাজি। সেই অভাবকে একটু হলেও পূর্ণতা দিবে সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে সীরাতুন নবী (সা.) বইটি। যা রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্ম পূর্ববর্তী ঘটনা, জন্ম, মক্কার পরিস্থিতি, মদিনার অবস্থা সহ শেষ অন্তীম এসব কিছুই জানতে পারবেন সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে।

শুকরিয়া করতেই হবে লেখক জর্দানের খ্যাতনাম হাদীস-বিশেষজ্ঞ ইবরাহীম মুহাম্মাদ আলি'র। যিনি লক্ষ লক্ষ হাদিসের মধ্যে থেকে সীরাত সম্বলিত হাদিসগুলো একত্রে করে উম্মাহ'র সামনে তুলে ধরেছে। সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ (সা.) গ্রন্থে।

দ্বীন ও আধুনিক
শিক্ষার সমন্বয়...

মুহাম্মদ সেলিম উল্লাহ
প্রিন্সিপ্যাল
মোবাইল : ০১৮৬৭ ৩৮৫৬১৭

তাহ্জীবুল উম্মাহ আদর্শ মাদ্রাসা

প্রধান ক্যাম্পাস : বাড়ি # ১৬, রোড # ০১, লেইন # ০১, ব্লক # এইচ, হালিশহর আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম ফোন : ০৩১-৭১১৩৯৩, মোবাইল : ০১৮৬৭ ৩৮৫৬১৭
ইপিজেড ক্যাম্পাস : মান্নান চৌধুরী বিল্ডিং, ওয়াশিল চৌধুরী বাড়ি, কমিশনার রোড, বন্দর চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮৭৭ ৭২৫১৯১

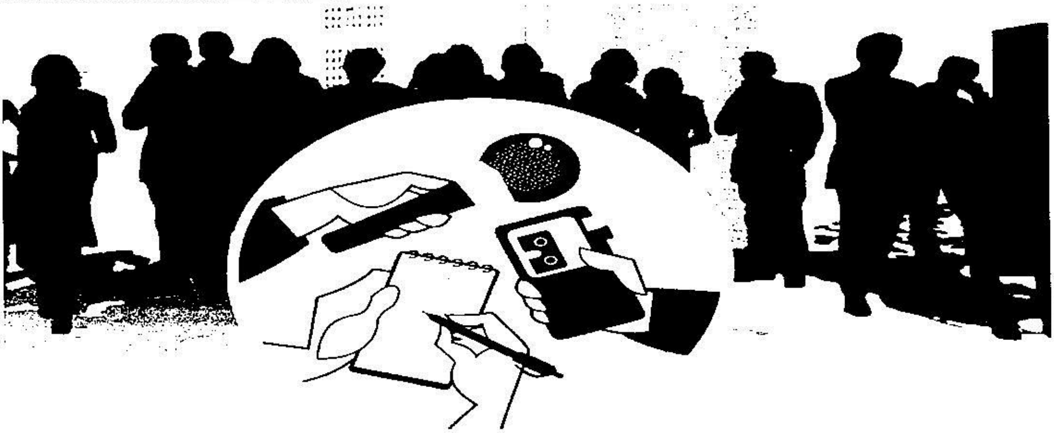

সাংবাদিকতাও হতে পারে নবীওয়ালা কাজ

ড. আবুল কালাম আজাদ
লেখক : বিশিষ্ট গবেষক ও দাঈ ইলাল্লাহ, লন্ডন
সাবেক শিক্ষক, কুরআনিক সাইন্স অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

সাংবাদিকতাকে আমরা একটা আধুনিক পেশা হিসাবেই জানি; যা প্রধানত ইহজাগতিকতা নিয়েই বৃত্তায়িত হয় এবং তার নেই কোন পারলৌকিক সংশ্লিষ্টতা। কিন্তু আপনারা জেনে হয়ত অবাক হবেন, এই সাংবাদিকতার মূল রচয়িতা হলেন আমাদের ধর্ম বিধাতা। হ্যাঁ, আমিও জেনে অবাক হয়েছি যে, সাংবাদিকতাটা শুধুমাত্র ইহলৌকক পেশা নয়, এটা হলো একটা ধর্মীয় পেশা। তাই এটা শুধু সুনাম, খ্যাতি ও টাকা কামাইয়ের পেশা নয়, বরং এটা বিশাল সাওয়াব বা ঐশী পুরস্কার লাভেরও পেশা। কারণ, এটা ছিলো নবীদের পেশা।

কীভাবে? শুনুন তাহলে এবারঃ

আরবিতে সংবাদকে বলা হয় 'নাবা'। পবিত্র কুরআনের তিরিশ পারার প্রথম সূরার নাম হলো- 'সূরাতুন নাবা' বা সংবাদের সূরা। এ শব্দ থেকেই এসেছে 'নবী, যার মানে হলো- সংবাদ বাহক বা 'সংবাদদাতা'। আর 'সংবাদদাতা' তাদেরকেই বলে যারা সাংবাদিকতা করেন। আল্লাহ পাক মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করা যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকেই নির্বাচন করেছিলেন সংবাদদাতা হবার জন্যে এবং এদের নাম দিয়েছেন নবী বা রাসূল। রাসূল শব্দটার সাথেও সংবাদ বহনের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আল্লাহর নবী ও রাসূলরা ছিলেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিয়োজিত মুখপাত্র ও সংবাদদাতা। এই সংবাদ দেওয়া বা সংবাদ প্রচার করা শুধু তাদের পেশা ছিলো না, এটা ছিলো তাদের (নবীদের) নেশা ও মিশন। আধুনিক যুগের সাংবাদিকেরা হয়ত বেতন-ভাতার বিনিময়ে বা কেউ কেউ সুনাম ও খ্যাতির জন্যেও সাংবাদিকতা করেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের পাঠানো নবী-রাসূল (সংবাদ দাতারা) দুনিয়ার কারো কাছ থেকে কোন প্রকার প্রশংসা, সুনাম ও টাকার জন্যে এই পেশায় আসেননি। আল্লাহর দেওয়া এই দায়িত্ব পালনের জন্যে তারা কারো কাছ থেকে কোন বেতন-ভাতা এমনকি কোন উপহার নেওয়া তো দূরের কথা, তা কামনাও করেননি। নবীরা এতো মহান ছিলেন যে, তারা যদি কাউকে কিছু খাওয়াতেনও, তখন বলতেনঃ "আমরা তো আপনাদেরকে খাওয়াই আল্লাহ পাককে খুশী করার জন্যে। আপনাদের কাছ থেকে এর জন্যে কোন প্রতিদান বা ধন্যবাদও আশা করি না" (সূরা ইনসানঃ ৯)।

তবে, নবীদের সাংবাদিকতার বিষয়, ধরন ও পদ্ধতি ছিলো আলাদা। সেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংবাদ ছিলো। কিন্তু সবই ছিলো সত্য, নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। সেই সংবাদগুলো পরিবেশনার ছিলো গভীর মর্ম ও উদ্দেশ্য। তার ভাষা ও ব্যঞ্জনা ছিলো ইতিবাচক ও গঠনমূলক। তাদের সংবাদে ছিলো নতুনত্ব, বৈচিত্র ও ভারসাম্য। তা ছিলো জীবনের একেবারেই বাস্তব ও নিটুট চিত্র। পবিত্র কুরআনের

মাধ্যমে রাসূলল্লাহ (স.) যে সংবাদ আমাদের কাছে এনেছেন তা গভীর ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে, সেখানে এই দুনিয়ার সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তবে তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিপক্ক। আজকের সংবাদপত্রের পাতায় কোন প্রেমের কাহিনী পড়ে দেখুন আর সূরা ইউসুফের প্রেমের গল্প পড়ে দেখুন। বিস্ময়করভাবে, আল্লাহ পাক সেখানে এমনভাবে যৌনতার বিবরণ দিয়েছেন যে ঘটনার মূল আবেদন একেবারেই চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছে, কোন প্রকার প্রকাশ্য নগ্নতার আচড় ছাড়াই।

এসব কিছু বিবেচনা করে আধুনিক যুগের ইসলামী স্কলাররা সাংবাদিকতা ও মিডিয়ায় কাজ করাকে ফরজ বলে অভিহিত করেছেন। বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যে, 'আমার কাছ থেকে একটা কথা শিখলেও তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও'। সাংবাদিকতা ও মিডিয়া হলে সেই দায়িত্ব পালন করার অন্যতম মাধ্যম। যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগে লেখালেখির তেমন প্রচলন ছিলো না, তবুও রাসূলুল্লাহ (স.) কলম ও জিহবার যুদ্ধকে জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদেরকে সাহিত্যের মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরকে অন্যদের কাছে তুলে ধরার উৎসাহ দিয়েছেন।

যেহেতু সাংবাদিকতা একটা মহান পেশা, তাই এই পেশায় নিয়োজিতদের অশেষ সাওয়াব লাভের সুযোগ আছে। লেখকের কলমের একটু খোচায় যদি কেউ আলোর সন্ধান পান, তাহলে লেখকও সেই আলোর জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন।

এই পেশা নবীদের পেশা। তবে, তা যদি হয়ঃ

১. এই পৃথিবীর মহাসত্য আলাহ পাকের একত্ববাদের স্বপক্ষে।

২. নৈতিকতার ও মানবতার পক্ষে।

৩. নিখুঁত ও সত্য।

৪. ইন্সাফ, সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে।

৫. পেশাগত দক্ষতায় ভরপুর।

মনে রাখতে হবে, মসজিদের ওয়াজ মাহফিলের ভাষা আর পত্রিকা, টিভি-রেডিওর ভাষা এক নয়।

দায়িত্বশীল ও সৎ সাংবাদিকতা সমাজকে সংশোধন করে ও উন্নত করে। কিন্তু এই পেশা যদি মিথ্যা ও ভন্ডামিতে আক্রান্ত হয় তাহলে তা সমাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সৎ সাংবাদিকতা করে জান্নাতে যাওয়া যেমন সহজ, অসৎ সাংবাদিকতা করে জাহান্নামেও যাওয়া আরো সহজ- যদি আমাদের সাংবাদিক সমাজ তা অনুধাবন করতেন!!

ফলে, একজন ইসলামী দাঈ যদি সাংবাদিকতাকে পেশা, নেশা ও দাওয়াতী কাজ হিসাবে নেন এবং ইসলামী নীতিমালাকে মেনে চলেন তাহলে তাঁর এই সাংবাদিকতার কাজ হবে সাওয়াবের কাজ, দাওয়াতের কাজ এবং জিহাদের কাজ। নির্ভয়ে, জীবনের ঝুকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং নিজের ও পরিবারের জীবন বাজী রেখে কোন সংবাদ পরিবেশনা করাও হতে পারে তাঁর জন্যে একটা জিহাদ।

আলেমরা যদি সাংবাদিক হন অথবা মুত্তাকীরা যদি সাংবাদিক হন তাহলে অসৎ সাংবাদিকরা আর ময়দান দখল করতে পারতো না। যেহেতু, এই দুনিয়াটা এখন সাংবাদিকতার যুগ। সেহেতু এই ময়দান থেকে আমাদের দূরে সরে থাকা যাবে না।

যারাই দাওয়াতী কাজ করেন, পড়েন ও পড়ান তাদের জন্যে সাংবাদিকতা বিষয়টা থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ বিভাগে সাংবাদিকতা একটা সাবজেক্ট থাকা দরকার। সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণও হওয়া দরকার। সাংবাদিক হওয়ার জন্যে নয়, বরং সাংবাদিকদের ভাষাটা বুঝার জন্যে।

মাসিক
দা'ওয়াহ

পড়ুন, লিখুন
বিজ্ঞাপন দিন

মাসিক দা'ওয়াহ পত্রিকায় লেখা দেয়ার নিয়মাবলী:

১. ইসলামী প্রবন্ধ, ছোট গল্প, সমসাময়িক বিষয়, শিক্ষনীয় যেকোনো অভিজ্ঞতা, কবিতা ইত্যাদি লেখা কম্পিউটার/মোবাইল-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।
২. লেখা হতে হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায়। ১৫০০ শব্দের বেশী নয়।
৩. বাংলা ও আরবীতে লেখা যাবে।
৪. লেখা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
৫. লেখার সাথে লেখকের যথাযথ নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, ছবি (যদি পারা যায়) ইত্যাদি সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে।
৬. লেখা প্রকাশিত হলে লেখককে তা জানানো হবে এবং ধারাবাহিকভাবে তিন মাসের মাসিক দা'ওয়াহ পত্রিকা তার ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে
৭. লেখা পাঠানোর ঠিকানা: monthlydawah@gmail.com
৮. লেখা হোয়াটসআপেও পাঠাতে পারবেন: ০১৬৭৩৯০৯২০৫

শোকর ও কৃতজ্ঞতা : ফযীলত ও পদ্ধতি

এম হামেদ হাছন
অধ্যক্ষ, সলিমা সিরাজ মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা জামালখান, চট্টগ্রাম।

সুতরাং فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নেয়ামত অস্বীকার করনা।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদিন বিশিষ্ট সাহাবী মুআয (রা.) এর হাত ধরে বললেন, 'মুআয! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' জানের শত্রু কুরাইশ কাফেররাও যার সততা আর বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি কখনো, প্রাণপ্রিয় সেই নবীর কোনো কথায় তাঁর কোনো সাহাবী সামান্য সন্দেহ পোষণ করবে- তা কি ভাবা যায়! সঙ্গীদের এ অকৃত্রিম আস্থা ও ভালোবাসার কথা তাঁরও অজানা নয়। অথচ তিনিই আল্লাহর নামে কসম করছেন, তাও আবার এক ঘনিষ্ঠ সাহাবীর সঙ্গে! সাহাবী মুআয (রা.)ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হোক! আল্লাহর কসম, আমিও আপনাকে ভালোবাসি।' এভাবে ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'মুআয! আমি তোমাকে বলছি, কখনোই নামাযের পরে এ দুআটি পড়তে ভুল করো না-

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় এবং সুন্দর করে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২১১৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২৪

হাদীসের বাণী সূর্যালোকের ন্যায় পরিষ্কার, আল্লাহ তাআলার যিকির আর তাঁর সুন্দর ইবাদতের মতো তাঁর শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায়ও আমাদের ইসলামের এক পরম কাঙ্খিত বিষয়।

আল্লাহ বিশ্বাসী প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিই মনে করে, ভালো-মন্দ সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা সুখ-দুঃখ সবকিছুর তিনিই মালিক। তাঁর ইচ্ছাতেই পথের ফকির কখনো বড় অট্টালিকার মালিক হয়ে যায়, আর কাড়ি কাড়ি সম্পদের মালিকও সবকিছু হারিয়ে পথে নেমে আসে। মুমিন মাত্রই এ বিশ্বাস দৃঢ়তা ও আস্থার সঙ্গে হৃদয়ে লালন করে। এ বিশ্বাসে ভর করেই বিপদাক্রান্ত মুমিন 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলে সান্ত্বনা পায়। আবার কোনো নিআমত পেলে এ বিশ্বাসেই সে উচ্চারণ করে- শোকর আলহামদুলিল্লাহ কিংবা এসবই আল্লাহর দান।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, তোমার পরবর্তীতে আমি এক উম্মত পাঠাবো কোনো বিষয় যদি তাদের হাসিল হয় তাহলে তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং শুকরিয়া আদায় করবে, আর যদি অনাকাঙ্খিত কোনো কিছু তাদের পেয়ে বসে তাহলে তারা সওয়াবের আশায় ধৈর্য্যধারণ করবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৫৪৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১২৮৯; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৪১৬৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৬৭০৪

উম্মতে মুহাম্মদীর এই চরিত্র এভাবেই আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করেছেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট। আরেক হাদীসে বিষয়টি আরও পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মুমিনের বিষয়াদি কত আশ্চর্যের! তার সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটা তো কেবল মুমিনের ক্ষেত্রেই হতে পারে। সচ্ছলতায় সে শুকরিয়া আদায় করে, তখন তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ নেমে আসে তাহলে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯

কৃতজ্ঞতা আদায় যে কেবলই এক কাঙ্খিত বিষয় এমন নয়, বরং এর ব্যতিক্রম ঘটলে পবিত্র কুরআনে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারিও-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি

তোমরা অস্বীকার কর তাহলে আমার আজাব অবশ্যই কঠিন। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৭

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি, তাদের একজন ছিল শ্বেতরোগী, একজনের মাথায় ছিল টাক, আরেকজন ছিল অন্ধ। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তাদের নিকট এক ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস কোনটি? সে বলল, '(শরীরের) সুন্দর বর্ণ আর সুন্দর চামড়া। মানুষ যে আমাকে অপছন্দ করে!' ফেরেশতা তখন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার রোগ দূর হয়ে গেল এবং তার গায়ের রং ও চামড়া সুন্দর হয়ে গেল। এরপর ফেরেশতা তাকে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদের কথা বলো! সে বলল, উট। তখনি তাকে একটি গর্ভবতী উটনী দেয়া হলো। ফেরেশতা তার জন্যে দুআ করলেন- আল্লাহ তাতে তোমার জন্যে বরকত দান করুন। এরপর ফেরেশতা চলে গেলেন টেকো ব্যক্তির কাছে। তাকেও জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস কোনটি? সে বলল, 'সুন্দর চুল। মানুষ যে আমাকে এ টাকের জন্যে অপছন্দ করে!' ফেরেশতা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তার মাথা সুন্দর সুন্দর চুলে ছেয়ে গেল। এরপর ফেরেশতা তাকে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদের কথা বলো! সে বলল, গরু। তখনি তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। ফেরেশতা তার জন্যে দুআ করলেন- আল্লাহ তাতে তোমার জন্যে বরকত দান করুন। সবশেষে ফেরেশতা গেলেন অন্ধ ব্যক্তির কাছে। তার কাছেও একই প্রশ্ন; তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস কোনটি? সে বলল, 'আল্লাহ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন, আমি তাহলে মানুষদের দেখতে পারতাম।' ফেরেশতা তখন হাত বুলিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। এরপর ফেরেশতা তাকে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ কোনটি? সে বলল, ছাগল। তখনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হলো। ফেরেশতা তার জন্যে দুআ করলেন- আল্লাহ তাতে তোমার জন্যে বরকত দান করুন। এরপর তাদের উট, গরু আর ছাগলে আল্লাহ যথেষ্ট বরকত দিলেন। কারও মাঠভর্তি উট, কারও মাঠভর্তি গরু আর কারও মাঠভর্তি ছাগল। ফেরেশতা আবার এলেন। প্রথমেই উটের মালিকের কাছে গিয়ে বললেন, আমি মিসকিন, সফরে আমার সবকিছু হারিয়ে গেছে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। তিনি তো তোমাকে সুন্দর গায়ের রং, সুন্দর চামড়া আর এ ধনসম্পদ দান করেছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে একটি উট দাও, তাহলে আমি আমার সফর শেষ করে ফিরে যেতে পারব। সে বলল, আমার তো কত মানুষকে দিতে হয়! (তোমাকে দিতে পারছি না।) ফেরেশতা এরপর বলল, আমি তো মনে হচ্ছে তোমাকে চিনতে পারছি। তোমার কি শ্বেতরোগ ছিল না, যে কারণে মানুষ তোমাকে অপছন্দ করত? এরপর আল্লাহ তোমাকে এসব দান করলেন। সে বলল : এগুলো তো আমার বাপ-দাদার সম্পদ! ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ যেন তোমাকে সে অবস্থাতেই ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা গেলেন গরুর মালিকের কাছে। তার কাছেও একই ভাষায় সাহায্যের আবদার করলেন। সেও একই ভাষায় ফিরিয়ে দিল। ফেরেশতাও তার জন্যে একই বদদুআ করলেন; যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ যেন তোমাকে সে অবস্থাতেই ফিরিয়ে দেন। এবার ফেরেশতা ছাগলের মালিকের কাছে গিয়ে বললেন, আমি মিসকিন মুসাফির, সফরে আমার সবকিছু হারিয়ে গেছে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। তিনি তো তোমার চোখ ভালো করে দিয়েছেন আর এ ধনসম্পদ দান করেছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে একটি ছাগল দাও, যেন আমি আমার সফর শেষ করে ফিরে যেতে পারি। সে বলল, আমি তো অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমার চোখ ভালো করে দিয়েছেন; আমি দরিদ্র ছিলাম, তিনি আমাকে ধনসম্পদ দান করেছেন। তুমি যা ইচ্ছা নিয়ে নিতে পার। তুমি যাই কিছু নেবে আমি তোমাকে কিছু বলব না। ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমার কাছেই থাক; তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে, আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার দুই সঙ্গীর ওপর তিনি অসন্তুষ্ট। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৪৬৪

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ আল্লাহ তাআলার কী পরিমাণ নিআমত ভোগ করে তা কি কল্পনা করা যায়! সুস্থ দেহ, সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সুস্থ মন, সুস্থ পরিবেশ- সবকিছুই তো তাঁর নিআমত। সামান্য অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেই বুঝে আসে এ নিআমতের মর্ম। সুস্থ মাথা নিয়ে দিব্যি ছুটে বেড়াচ্ছে যে, মাথাব্যথার মতো দেখা যায় না এমন একটি রোগেও সে কাবু হয়ে পড়ে। উঠতে-বসতে, নিদ্রা-জাগরণে, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আমরা তাঁর নিআমতের সাগরে ডুবে আছি সর্বক্ষণ। এ নিআমত গণনার সাধ্য নেই কারও। আল্লাহ পাক তো বলেই দিয়েছেন-

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوْهَا

তোমরা যদি আল্লাহর নিআমত গুনতে চাও তাহলে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। -সূরা ইবরাহীম (১৪):৩৪

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন এ নিআমতের কৃতজ্ঞতা সম্বলিত বিভিন্ন দুআ। ভোরে ঘুম থেকে জাগার মধ্য দিয়ে যখন সূচনা হয় আমাদের দিনের, তখনকার দুআটি এমন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থাৎ সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর আবার জীবন দান করলেন আর তাঁর কাছেই তো আমাদের একত্রিত করা হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১১২

খাবার খেলে আমরা পড়ি-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৫০

খাবার পেলেই যে কেউ খেতে পারে বিষয়টি এমন নয়। আমাদের চারপাশে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যথেষ্ট সচ্ছলতা থাকার পরও ডাক্তারি বিধি নিষেধের কারণে যারা নিজেদের পছন্দের খাবারটিও খেতে পারেন না। তাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত টাকা পয়সায় কেনা খাবার খাওয়ার পর এ দুআটি শিখিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন- খাবার জোগাড় করতে পারা যেমন একটি নিআমত, তেমনি খেতে পারাও একটি নিআমত। আর উক্ত দুআর মধ্য দিয়ে এ নিআমতটিরই শুকরিয়া আদায় করা হয়। কৃতজ্ঞতা সম্বলিত এ দুআর তালিকাও ছোট নয়। যে কাজকর্মকে আমরা খুবই স্বাভাবিক মনে করি, স্বাভাবিকতায় সামান্য ব্যত্যয় ঘটলে আমরা বুঝি- আসলে এগুলোও আল্লাহর অনুগ্রহ। শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষাও তাই জীবনের সর্বত্রই ছড়ানো। এমনকি যখন কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে বেরিয়ে আসে তখনো আমাদের শেখানো হয়েছে কৃতজ্ঞতার দুআ-

غُفْرَانَكَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

অর্থাৎ তোমার কাছেই ক্ষমা চাই হে প্রভু! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার কষ্টকর বস্তুগুলো সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ রেখেছেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০১; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী, হাদীস ২২

মুমিন বান্দা জীবনে যা কিছু পায়, সবকিছুকেই সে আল্লাহর নিআমত বলেই বিশ্বাস করে। এসবকে নিজের মেধা-প্রতিভার ফসল মনে করবে সে কীভাবে, যেখানে মেধা-প্রতিভাকেই সে আল্লাহর দেয়া নিআমত বলে মেনে নেয়! নিজের যে কোনো অর্জনে তাই সে মহান প্রভুর দরবারেই সেজদাবনত হয়, কৃতজ্ঞচিত্তে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে সে উচ্চারণ করে- আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন বান্দার এ এক অনন্য গুণ।

কোনো নিআমতের শুকরিয়া আদায়ের জন্যে অপরিহার্য হলো, সে নিআমতটিকে কাজে লাগানোর সময় নিআমত দাতার ইচ্ছা ও চাওয়াকে গুরুত্ব দেয়া, তাঁর আনুগত্যে তা ব্যবহার করা। ব্যবসায় লাভ হলে আলহামদু লিল্লাহ বলার পর যদি সে লাভের অর্থ আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে খরচ করা হয় তাহলে এটা কেমন কৃতজ্ঞতা হলো!

আল্লাহর নিআমত পেলে বান্দা আনন্দিত হয়। আর সেই আনন্দ আল্লাহর অন্য বান্দাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়াটাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ নিজেই বলেছেন :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

আর তুমি তোমার প্রভুর নিআমতের কথা বলো। -সূরা দুহা (৯৩) : ১১

নিআমতের কথা অন্যকে জানানোই আনন্দ ভাগ করে নেয়ার একমাত্র পদ্ধতি নয়। বিয়ের পর ওলিমা অনুষ্ঠান, সন্তান জন্মের পর আকিকা- এসব তো আল্লাহর নিআমত স্মরণ করেই আয়োজিত হয়। তবে কথা হলো, এসব আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে অবশ্যই কৃতজ্ঞতার মানসিকতা পোষণ করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে- আনন্দের এ উপলক্ষ অর্জন ব্যক্তিগত কোনো কৃতিত্ব নয়?, বরং মহান প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। পরীক্ষায় পাশ, নতুন চাকরি লাভ ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা মিষ্টিমুখ বা এজাতীয় যে আয়োজন করি, উক্ত বিশ্বাস মনে ধারণ করতে পারলে এ আয়োজনেও কৃতজ্ঞতা আদায় হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর থেকে মদীনায় ফিরে আসতেন তখন তিনি একটি উট কিংবা গরু জবাই করে সাথী-সঙ্গী ও উপস্থিত সবার আপ্যায়নের আয়োজন করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০৮৯)

আল্লাহ তাআলার নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায়ে নফল রোযা-নামাযের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবারে রোযা রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

এটা এমন দিন, যাতে আমার জন্ম হয়েছিল আর এ দিনেই আমার কাছে ওহী আসার সূচনা হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

আর রাত জেগে জেগে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তে গিয়ে কখনো তাঁর পা ফুলে যেত। হযরত আয়েশা (রা.) একদিন তাই জানতে চাইলেন- আপনি এত কষ্ট করেন কেন, আল্লাহ কি আপনার আগে-পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন,

أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই না? -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭

এ কৃতজ্ঞতা মুমিনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরকালীন সমৃদ্ধির পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরও অধিক পরিমাণ নিআমত লাভের মাধ্যম এ কৃতজ্ঞতা। আর আখেরাতের অসীম পুরস্কারের ঘোষণা তো আছেই। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত করেই শেষ করছি- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

খেয়ে যে আল্লাহর শোকর আদায় করে সে ধৈর্য্যশীল রোযাদার ব্যক্তির সমান পুরস্কার লাভ করবে। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৬৫

দি-আদি চট্টগ্রামের টেইলারিং জগতে এক জনপ্রিয় নাম...
পাঞ্জাব টেইলার্স
পাঞ্জাবী, কাবুলী ও বোরকা স্পেশালিষ্ট
বিঃদ্রঃ আমরাই আন্দরকিল্লায় সর্বপ্রথম...
৩২ নং, মসজিদ মার্কেট
(মাঝখানে-২য় তলায়), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৮৬৯৩১৫
মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রোপ্রাইটর
০১৭১৬ ০৬৪৬৮৫
০১৮২৬ ৬৪৬১৮৩
দি-আদি পাঞ্জাব টেইলার্স এর নকল বের হয়েছে
নকল এড়িয়ে চলুন
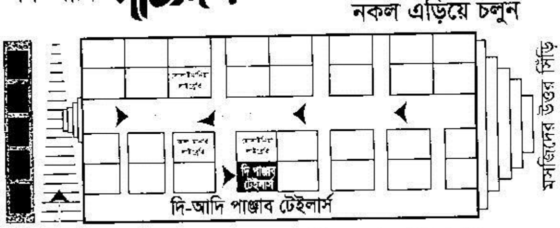

আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

মাসিক দা'ওয়াহ

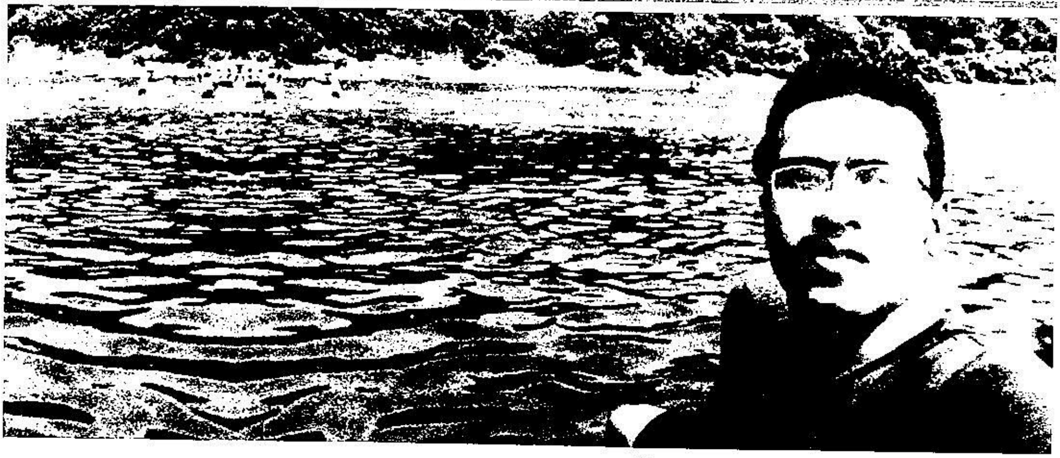

আবরার ফাহাদ হত্যা ঃ একটি পর্যালোচনা

ডা. মোহাম্মদ ওমর ফারুক
সভাপতি, রাউজান ক্লাব ও জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি), জেনারেল হাসপাতাল, রাঙ্গামাটি।

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকান্ড নিয়ে চল্ছে সারাদেশে হৈ চৈ। এটি টক অব দ্যা কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে এখন। দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে একজন মেধাবী অথচ তরতাজা যুবককে এভাবে পিটিয়ে মারতে হবে, এটা সভ্য সমাজে কোনমতে কাম্য নয়। যারা আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করেছে তারাও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কয়েকজন। বাক-স্বাধীনতা হরণ আমাদের দেশের জন্য এখন সাধারণ সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের মত প্রকাশের অধিকার খর্ব করা হয়েছে অনেক আগে থেকেই। আর দেশ-প্রেমের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে মারতে হবে-এ ধরনের নজির সম্ভবত বিশ্বের কোথাও নেই। ঘটনার সুষ্ট তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক-এটাই দেশবাসী চায়। এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে: রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সু-শাসন অনুপস্থিতির কারণে বারবার এ ধরনের অযাচিত ও অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনাগুলো ঘটছে। যারা এ নির্মম হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছে তাদেরকে কি তাদের পিতা-মাতারা সৎ ও পূর্ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেননি? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন চলার তাগিদ দেননি? এ জীবনের পরে রয়েছে একটি মহাজীবন, মহাকাল-যার কোন অন্ত নেই, সে জীবনে থাকতে হবে চিরকাল। হিসেব-নিকেশ, বিচার-ফয়সালা শেষে দুনিয়ার মানুষকে জান্নাত আর জাহানামে স্থান দেওয়ার নীতিমালা করে দেবেন স্বয়ং রাজাধিরাজ, আকাশ ও জমিনের একচ্ছত্র সিপাহ্সালার মহান রাব্বুল-আলামিন। সেদিন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে তাঁর কাছেই হাজির হতে হবে। 'তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার বদলে অন্য কোন বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, তা ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে' (সূরা আল্-ইমরান আয়াত-৮৩)। দুনিয়ার জীবনের যে নেক আমল, তার হিসাবের ভিত্তিতেই আখেরাতের স্থায়ী জীবনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা। এখানে মিলবে না কোন সুপারিশ-সেটাই মহান রাব্বুল আ'লামিন স্পষ্টভাবে আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবে, '(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা) তোমরা সেদিনটিকে ভয় কর, যেদিন একজন আরেকজনের কোন কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের (পক্ষে) কোন সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, (মুক্তির জন্যে) কারো কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেয়া হবে না-না তাদের (সেদিন কোন) সাহায্য করা হবে' (সূরা বাকারা আয়াত- ৪৮)।

যদি পরকালের জীবন, আখেরাতের শাস্তি, হত্যাকান্ডের নির্মম শাস্তি কী হতে পারে ইত্যাদি আবরার হত্যাকারীদের পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ছোটবেলায় কুরআন হাদিসের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন তাহলে হয়তো এ ধরনের জঘন্য অপকর্ম থেকে সরে আসতে বাধ্য হত খুনিরা। আফসোস, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী পুস্তক, মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় এ কুরআন আজ নিগৃহীত, অবেহেলিত-এ কুরআন থেকে আমরা কোন শিক্ষা নিই না। কুরআনের প্রেসক্রিপশন মানি না, কুরআনের বিধান মানি না। এজন্যেই সারা বিশ্বে আজ চল্ছে মহা হত্যাযজ্ঞ অথচ ১৫শ' বছর আগেই আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, (তারাই হচ্ছে) কাফের' (সূরা আল্-মায়েদা আয়াত-৪৪)।

আল্লাহর নাযিল করা বিধান পবিত্র আল কুরআনের একটি আয়াতও যদি কেউ অমান্য বা অস্বীকার করে বা কৌশলে গোপন করে বা রাষ্ট্রশক্তির অযুহাতে প্রচার না করে তাহলে তার মুসলমানিত্ব থাকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সে কথাটিই আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন এভাবেই, 'নিসন্দেহে যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের অংশ-বিশেষ গোপন করে রাখে এবং সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়, তারাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের পবিত্র করবেন না, এদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব' (সূরা বাকারা আয়াত-১৭৪)। আমার বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) এর ওফাতের পর যখন তার মরদেহ কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত আবু যর গিফারী কবরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'হে কবর, তোমার মাঝে আজ বিশ্ব জাহানের মহীয়সী নারী, নবীজির প্রাণের ধন, হযরত আলীর সহধর্মিনী ফাতেমাকে রাখা হচ্ছে, বেয়াদবী করিস্ না। এভাবে তিন তিনবার বলার পর কবর থেকে আওয়াজ উঠল, 'আমি ফাতেমা বুঝি না, নবীজির কন্যা বুঝি না-আমি বুঝি কবর বাসীর নেক আমল।' যেখানে আমার নবীজির প্রাণপ্রিয় কন্যার এ অবস্থা সেখানে আমাদের মত নরাধমদের কী অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। নবীজির বিবি হযরত হযরত খাদিজাতুল কোবরাকে কবরে শায়িত করার পর কবরের পাড় থেকে বিশ্বনবী আসতে চাচ্ছিলেন না, মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র) রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, 'হে রাসূল (সা.) অনেক তো হল, এবার চলেন যাই, রাসূল (সা.) বললেন, না আবু বকর তুমি চলে গেলে যেত পার-আমি যাব না।' খাদিজা যদি ফেরেশতাদের তিনটি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে তা আমি জবাব দিয়ে তারপরে যাব। সাথে সাথে মহান রাব্বুল আ'লামিন হযরত জিবরিল আমিন এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর কাছে সংবাদ পাঠালেন, হে আল্লাহর প্রিয় হাবিব আপনি চলে যান, খাদিজা যদি কবরের ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আরশে আজিমের উপর থেকে জবাব দিয়ে দেবেন- সুবহানাল্লাহ। রাসূলের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী খাদিজাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর যে উৎকন্ঠা, তাতে আমাদের জন্য রয়েছে অনুকরণীয় শিক্ষা। এ দুনিয়ায় যারা অপকর্ম করে, বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা করে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে সু-নির্দিষ্ট সংবাদ। আবরার ফাহাদ আজ নেই-রয়ে গেছে তার অনুপম আদর্শ, ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত তার শ্রেষ্ট কথামালা। আবরার হতে পারে দেশপ্রেমিক ছাত্র যুবাদের অনুকরণীয় আদর্শ, আমরা হারাতে চাই না আর কোন আবরার। এখন থেকেই আমরা ছুটে চলব সেই মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের দিকে, যার শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের জীবন হবে আলোকিত, মুক্তি পাবো আখেরাতের কঠোর শাস্তি থেকে। সম্মানিত পিতা মাতাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব, এখন থেকেই আপনার সন্তানদের লাগাম টেনে ধরুন, প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ভেসে যাওয়া যুবকদের হাতে তুলে দিন অর্থসহ কুরআনের একটি খন্ড; যেখান থেকে তারা পাবে শান্তির পরশ, বেহেশ্তি জীবনের অমোঘ আকর্ষণ। আর এতেই তাদের জীবন পাল্টে যাবে নিমিষেই। হৃদয়ে হৃদয়ে অনুরণন হবে আবাধ্য উর্মিমালা। আসুন, 'সেই দিনটিকেই ভয় করি, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, অতপর সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে (তার) কামাইর ফলাফল দেয়া হবে, তাদের উপর কোন ধরনের জুলুম করা হবে না-সূরা বাকারা আয়াত-২৮১।'

মুসলিম হওয়ার গল্প-(২)

মুহাম্মদ নূরন্নবী
শিক্ষক, আইডিয়াল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

পূর্ব প্রকাশের পর

আমার বাবাকে পুড়িয়ে নি:শেষ করতে তাদের প্রায় তিন ঘন্টার মতো সময় লাগল। তাদের চোখে মুখে কী তৃপ্তি! আমার বাবার মৃতদেহের সৎকার করতে গিয়ে তাদের দারুণ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল কারণ বাবার দেহটি নাকি সহজে পোড়া যাচ্ছিল না,আমাদের মতো ছোট শিশু থাকাতে নাকি উনার বুক পোড়া যাচ্ছিল না। আহা! কী দু:সহ স্মৃতি! ও একটা কথা বলা হলো না-আমার বাবার শরীর অর্ধেকটা পোড়ানো অবস্থায় বাবার চেয়ে বয়সে ছোট ছেলেরা এক বিঘত পরিমাণ আম কাঠ নিয়ে বাবার জ্বলন্ত চিতার সামনে পর্যায়ক্রমে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে কাঠ চিতায় দিচ্ছিল। আমাকেও কাঠ নিয়ে বাবার জ্বলন্ত চিতায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমিও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জ্বলন্ত চিতায় প্রণাম করে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে কাঠ চিতায় দিলাম। আমি বাবার পা থেকে জ্বলন্ত চিতায় মাংস খসে পড়তে দেখলাম, যার কারণে আমি প্রায় দুই বছর অসুস্থ ছিলাম। প্রতি রাতে আমি ঘুমের মধ্যে চিৎকার দিয়ে কান্না করে উঠতাম।

আমার মাকে আমি প্রায় সময় জিজ্ঞেস করতাম, "সবার বাবা শহর থেকে বাড়িতে আসে, আমার বাবা আসে না কেন?" কী করে বুঝাবে আমার মা, মা আমাকে জড়িয়ে ধরতেন, তাঁর উষ্ণ অশ্রু ধারায় আমার মুখমন্ডল সিক্ত হয়ে যেত। হাইস্কুলে পড়াবস্থায় মৃতদেহ পোড়ানোর বিষয়ে চিতাখোলায় (মৃতদেহ দাহ করার স্থান) আমি বেশ প্রতিবাদ করতাম, তারা আমাকে ভুলভাবে অনেক কিছু বুঝাতো তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে শেয়ার করব, যা আমাকে পরবর্তীতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে সহায়তা করেছে। তাদের সে শিক্ষাসমূহ এবং আমার মুশরিক থাকাবস্থার ভাবনা আমি নিম্নে পেশ করছি-

শিক্ষা (১): আমরা পোশাক পরিধান করি, পুরাতন ও নষ্ট হলে ফেলে দেই। আত্মাও সেরূপ দেহ ধারণ করে আবার দেহ ত্যাগ করে। তাই দেহের কোনো মূল্য নেই। আত্মার কোনো মৃত্যু নেই। আত্মা অবিনশ্বর।

ভাবনা: যদি দেহের কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে মুশরিকদের সাধু সন্যাসী ও বিত্তবান মানুষদের পোড়ানো হয় না কেন? সমাধি দেয় কেন? দেহের কোনো মূল্য না থাকলে সমাধি কিংবা পোড়ানোর প্রয়োজন কী? এ কথা চিন্তা করে একবার আমি আমার দেহ মৃত্যুর পরে মেডিকেলে দান করার অঙ্গীকার করতে গিয়েছিলাম!

শিক্ষা (২): মানবদেহ দাহ করা বিজ্ঞানসম্মত, আগুনে পুড়লে জীবাণু ধ্বংস হয়। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।

ভাবনা: কী কপাল পোড়া! কোথায় গেল মানবিকতা! বিজ্ঞানের অজুহাত দিয়ে কি নিজ মা,বাবা,আত্মীয়দের আগুনে পোড়ানো যাবে!

শিক্ষা (৩): সব মানুষের আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা মানে সৃষ্টিকর্তা। বার বার দুনিয়াতে জন্ম নেয়ার পর আত্মা মুক্তি লাভ করে। মুক্তি লাভ করার জন্য প্রত্যেক প্রাণীর দেহধারণ করতে হয়, অবশেষে মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়। দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে অবশেষে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।

ভাবনা: আত্মা যদি পরমাত্মার অংশ হয় তাহলে সব প্রাণী উন্নত শ্রেণির প্রাণী হিসাবে জন্ম নিতে পারত। অ্যামিবা,হাইড্রা,গুণগুণি পোকা, ছারপোকা, কুকুর, শকুন ইত্যাদি হিসেবে জন্ম নিত না। আমরা সবাই সৃষ্টির সেরা মানুষ হতে পারতাম।

শিক্ষা (৪): আমরা অগ্নি উপাসক, সারাটা জীবন অগ্নির পূজা করি, তাই অগ্নির সাথে মিশে যাওয়ার বাসনা আমাদের থাকা চাই। তাই মৃতদেহ সৎকার অর্থাৎ দাহ করা হয়।

ভাবনা: দুনিয়াতে কোনো একজন যদি কোনো লোকের গোলামি করে, তাহলে সে মালিক কি গোলামকে নি:শেষ করে দিতে পারে! তার আগুনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করার কথা, যেভাবে আমরা বাতাসে হাঁটাচলা করি!

এভাবে তাদের সাথে উল্টাপাল্টা জীবনযাপন করতে করতে একটা সময় আমার মনে প্রচন্ডভাবে ভাবনা শুরু হয়ে গেল এবং প্রতিনিয়ত দু:খ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি দিনাতিপাত করতে লাগলাম। আর আমি চিন্তার সাগরে অবগাহন করতে লাগলাম-

"অন্ধকার কী, তা যদি না বুঝি, আলোর উপস্থিতি বুঝিব কেমনে? মূর্খতা কী, তা যদি না জানি, জ্ঞানের দীপ্ত প্রকাশ কীরূপে চিনি। আল্লাহর একত্ববাদ না বুঝিলে, শিরক বুঝিব কোন ছলে। বিদ্যালয়ের এক মুসলিম শিক্ষক বলেছিলেন মোদের, ইবাদতের জন্য সৃষ্টি মানুষের। আল্লাহর বিধান মানাই ইবাদত, পূজার

বিপরীতটাই ইবাদত। আল্লাহকে যেরূপে জানি, অন্যদের সেরূপে জানাই শিরক। শিরক বড় ভয়ংকর, হবে না সে পাপ মার্জনা। সময় থাকতে না বুঝিলে, কিছুতে পার পাবো না। মাথা নত শুধু আল্লাহর কাছে, যা বলুক মোরে লোকে পাছে। মুশরিক থাকাকালে কত দোয়া করেছি আল্লাহর কাছে, কেমনে ভাঙিব শিরকের বৃত্ত, রয়েছে যা মোর চারপাশে।"

যে কথা বলছিলাম, আমার মায়ের কাছে বাবার শহর থেকে গ্রামে আসছে না কেন, তা বার বার জিজ্ঞেস করতাম। জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে নি:শেষ করার পরও প্রায় পাঁচ বছরের মতো এ ছেলে কীভাবে অনুধাবন করবে যে, তার বাবা ফিরে আসবে না। মা আমার, মিথ্যে আশ্বাস দিতেন, প্রতি রাতে । একটা সময় আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। কয়েকদিন পর আমরা আবার বাবাকে যেখানে দাহ করা হয়েছে, সেই চিতায় গেলাম। কিছু মানুষ বাবার চিতা থেকে ভস্ম (ছাই) সমূহ তুলে নিচ্ছিল এবং একজন দেখি কিছু পোড়া অস্থি সংগ্রহ করছিল। পরে জানলাম-অস্থিগুলো গয়ায় (নদী) বিসর্জন দেয়া হবে, বাবার মুক্তির জন্য। বাবার চিতার ভস্মসমূহ চার-পাঁচজন লোক বহন করে আমাদের বাড়ির পাশের ছোট নদীতে ফেলে দিল। বাবার চিতাটি মাটি দিয়ে ভরাট করে বাঁশের ঘেরা দেয়া হলো। আরও দুই-তিন দিন পর দেখি, আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথি আসল এবং বিশাল এক পূজা (শ্রাদ্ধানুষ্ঠান) আয়োজন করা হলো। যা করলে নাকি বাবার আত্মার সদগতি হবে। সদগতি মানে কী? তখন আমি বুঝিনি। পরবর্তীতে জানলাম, সদগতি মানে পরমাত্মার (সৃষ্টিকর্তা) সাথে মিলিত হওয়া। কী অদ্ভুদ কথা!

এভাবে এক বিশাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের স্মৃতি থেকে আমার প্রিয় বাবাকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করা হল। সবাই ভুললে কি আর আমি ভুলি! পুরো সিস্টেমটার ব্যাপারে আমার মন সন্দিহান হয়ে গেল। দুনিয়ার মোমবাতির আগুনে আমাদের হাত লাগলে আমরা সাথে সাথে হাত সরিয়ে ফেলি, আর মানুষ কাঠের মতো পুড়ে নি:শেষ করলে কেমন কষ্ট হয়! আমার মুসলমান বন্ধুরা ৫ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় আমাকে জানাল, মানুষ মারা গেলে তাদের শরীর বেশি ব্যথা পায়, খুব সাবধানে নড়াচড়া করতে হয়। আরো কত কিছু তারা আমাকে বলল। কী দু:সহ সেসব দিন রাত্রি!

যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, তখন একদিন খেয়াল করলাম, আমার মমতাময়ী মা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে এক বালতি পানি নেয় এবং আমাদের গোয়াল ঘর থেকে গোবর নিজ হাতে নিয়ে বালতির পানিতে মেশানো শুরু করল। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি, মা আমার কী করতে যাচ্ছেন!! *চলমান... ... ...*

উত্তর প্রদানে
মোঃ শাহ্ জালাল
সহকারী অধ্যাপক, দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

প্রশ্ন: জনৈক ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। বর্তমানে সে উক্ত ঋণ পরিশোধে অক্ষম এবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। এমতাবস্থায় ঋণদাতা এই ঋণকে যাকাত হিসাবে গণ্য করলে তা আদায় হবে কি না?

উত্তর: যে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের সামর্থ নেই, তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা বৈধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ-

'যাকাত হচ্ছে ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী ও যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য। আর দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর রাস্তা ও মুসাফিরের জন্য' (সুরা আল-তাওবা, আয়াত ৬০)।

এ দ্বারা বুঝা যে, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার জন্য ফকির কিংবা মিসকিন হওয়া শর্ত নয়। বরং ইহা আলাদা একটি খাত। কেউ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে এর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে যে, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি এক পক্ষ থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন এবং অন্য পক্ষকে তা ঋণ হিসাবে পরিশোধ করবেন। অনুরূপভাবে ঋণদাতা যদি কোন প্রকারের শর্তারোপ ছাড়া ঋণগ্রহীতাকে যাকাত প্রদান করেন এবং ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় উহা দ্বারা যাকাত দাতার ঋণ পরিশোধ করেন, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এটি বৈধ। কিন্তু ঋণদাতা যদি এই শর্তে যাকাত প্রদান করেন যে, ঋণগ্রহীতা উহা দ্বারা যাকাত দাতার ঋণ পরিশোধ করবেন অথবা ঋণগ্রহীতাকে কোন কিছু না দিয়ে তার কাছে প্রাপ্য ঋণকে যাকাত হিসাবে গণ্য করেন, তাহলে তা যাকাত হিসাবে আদায় হবে কি না- এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

১। হানাফী, মালিকী, হাম্বালী ও শাফিয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামদের বাখ্যানুযায়ী এটি বৈধ নয় এবং এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে না। তারা তাদের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ পেশ করেন:

ক. যাকাতদাতা মূলতঃ ঋণগ্রহীতাকে যাকাত হিসাবে কিছুই প্রদান করেনি। বরং সে যা করেছে তা ছিল তার ঋণ ও পাওনা আদায়ের কূটকৌশল- যা শরিয়তে গ্রহনযোগ্য নয়।

খ. যাকাত প্রদানের শর্ত হচ্ছে মালিকাধীন বস্তু যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা। ঋণগ্রহীতার কাছে প্রাপ্য সম্পদ যদি ফিরে পাবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তা পরিপূর্ণ মালিকাধীন সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয় না। তাই এ জাতীয় সম্পদ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাতও ওয়াজিব হয় না।

গ. যাকাতের আরেকটি শর্ত হচ্ছে যাকাত গ্রহীতার কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করা। আর এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়নি। কারণ ঋণগ্রহীতা তা নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারের অধিকার পায়নি।

ঘ. ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত নিয়ত করা। আর নিয়তের সময় হলো ইবাদতের পূর্বমূহুর্ত। কোন ইবাদত সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর নিয়তের পরিবর্তন করলে তাতে ইবাদতের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন কেউ নফল নামাজ পড়ার পর উহাকে ফরয নামাজ হিসাবে গণ্য করলে উহা ফরজ হিসাবে আদায় হয় না। তেমনিভাবে যা প্রথমে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তীতে তাতে যাকাতের নিয়ত করলেও তা যাকাত হিসাবে আদায় হবে না।

ঙ. রাসুল (স.), সাহাবী ও তাবিয়ীদের যুগে কেউ এ পদ্ধতিতে যাকাত প্রদান করেননি এবং তাদের কেউ এটি সমর্থনও করেননি।

২। হাসান বসরী, আতা বিন রাবাহ, ইবনু হাযম ও শাফিয়ী মাযহাবের কোন কোন আলেমের মতে উক্ত

পদ্ধতিতে যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাজম বলেন:

وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ مَاشِيَةً فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ قِبَلَهُ، وَنَوَى بِذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ زَكَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ

'যদি কারো যাকাত গ্রহনের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছে ঋন বা পাওনা থাকে- তা গম, কিংবা যব, কিংবা সোনা রূপা, কিংবা কোন প্রাণী যাই হোক না কেন- আর ঋনদাতা ঋণের পরিবর্তে উহা তাকে সদকা করে দেয় এবং যাকাতের নিয়ত করে, তাহলে উহা আদায় হবে'। উপরোক্ত ইমামগন তাদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ পেশ করেন।

ক. প্রবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

'ঋনগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দিবে। আর যদি সদকা হিসাবে দিয়ে দাও, (অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এর অর্থ যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও) তাহলে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম- যদি তোমরা জানতে' (সুরা আল বাকারা, আয়াত ২৮০)। আল-কুরআনের অনেক জায়গায় সদকাকে যাকাত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রস্থকে প্রদত্ত ঋণ যাকাত হিসাবে দিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে।

খ. আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত:

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ -

এক ব্যক্তি গাছে থাকা ফল ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্থ হল। এতে তার ঋণের পরিমান বেড়ে গেল। তখন রাসুল (স.) বললেন: 'তোমরা তাকে যাকাত দাও'। লোকেরা তাকে যাকাত দিল। কিন্তু তাতে তার ঋণ পরিশোধ হলো না। তখন রাসুল (স.) ঋণদাতাদের বললেন: 'তোমরা যা পেয়েছ তা নিয়ে নাও। এর অতিরিক্ত তোমরা আর কিছুই পাবে না' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪০৬৪)। ইমাম ইবনু হাজম বলেন: এ হাদিসে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার জন্য রাসুল (স.) যাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঋণদাতারাও ছিল।

গ. কোনো অভাবগ্রস্থ মানুষের কাছে যদি কারো আমানত থাকে, আর আমানতকারী উহা আমানত গ্রহীতাকে যাকাত হিসাবে দিয়ে দেয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ঋণদাতা যদি তার পাওনা ঋণগ্রহীতাকে যাকাত হিসাবে দিয়ে দেয়, তাহলে তাতেও যাকাত আদায় হবে।

বর্তমান যুগের আলেমদের মধ্যে শেখ বিন বাজ ও শেখ উসাইমিনসহ অধিকাংশ আলেম প্রথম মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ছেন। অপর দিকে ড. ইউসুফ আলকারদাবীসহ কোনো কোনো আলেম দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করেছেন। আমাদের বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে প্রথম মতটির উপর আমল করা যুক্তিযুক্ত। কারণ যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিয়তের পরিশুদ্ধি যেমন অত্যাবশ্যক। তেমনিভাবে সন্দেহ-সংশয় পরিহার করে সাবধানতা অবলম্বন করাও অপরিহার্য। রাসুল (স.) ইরশাদ করেন:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ

'হালাল বিষয়গুলো স্পষ্ট। হারাম বিষয়গুলোও স্পষ্ট। এ দুইয়ের মধ্যবর্তী কিছু অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। অনেক মানুষই জানে না যে, সেগুলো হালাল না হারাম। কেউ যদি সেগুলো তার নিজের সন্মান এবং দ্বীনের পবিত্রতার জন্য পরিহার করে, সে নিরাপদ থাকল। আর কেউ যদি তাতে লিপ্ত হয়, তাহলে হারাম কাজে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে' (সুনান আল-তিরমিজি, হাদিস নং ১২৪৬)।

বিনম্র সেজদায়

মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, আইআইইউসি

মাবুদ আমার বন্ধু আমার
আমায় নত করো তোমার পতাকা তলে
প্রতিটি নামাজের প্রথম সারিতে
বিনম্র সেজদায়।

আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু তুমি 'মাওলা
আমি যে তোমারই প্রতিনিধি
তোমার রাসূলের (সা:) আদর্শেই অবিচল
তাই ভালোবাসা প্রতিটি জীবনের প্রতি।

লোভ-লালসা হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ ক'রে
বাতিলের পথ ছেড়ে, হক পথে
সারাটা জীবন চালিয়ে যেতে চাই।

এমনি সে জীবন, যা আত্ম-সংগ্রামের
মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে
তোমার দানের শ্রেষ্ঠ আমানত
দুনিয়ার দশ-দিগন্ত ব্যাপী 'ইসলাম'।

মানুষ জাতি

সোলাইমান হোসেন রাকিব
ছাত্র, দা' ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, IIUC

মানুষ জাতি বড়ই আজিব যায়না এদের চেনা,
বন্ধু সেজে শত্রুরা ভাব করে লেনাদেনা।
চলার পথে হাজার জনের হাত মেলানোর হাল,
কে জানতো এদের মাঝেই থাকে কিছু কাল।

স্বার্থ-টানে পিছু নিয়ে লেগে থাকে রোজ,
স্বার্থ হাসিল হলেই বাপু নেয়না কারো খোঁজ।
পিছু নিয়ে থাকে এরা মানব ক্ষতির নেশায়,
ক্ষতি সাধন এখন তাদের প্রধান হলো পেশায়।

ভালো জেনে যবে তাদের মিলাই হাতে হাত,
ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে তারা চেনায় তাদের জাত।
মানুষ জাতি বড়ই আজিব বিশ্বাস করা দ্বায়,
মানুষ জাতির এ-ই কি যে হাল হায়রে মানুষ হায়।

থাকতে সময় মানুষ জাতি হওনা বিবেকবান।
মানবতার জন্য তুমি দাওনা তোমার প্রাণ।
রবের ভাষায় তুমিই সেরা সত্যি হবে তবে।
ক্ষতি সাধন ছেড়ে দিয়ে মানুষ হবে যবে।

ভেবেছো কি কখনো বন্ধু

আমান উল্লাহ
ছাত্র, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, IIUC

রঙিন স্বপ্নে সবাই বিভোর,
কবে হবে স্বপ্ন পূরণ।
ভেবেছো কি কখনো বন্ধু
পথশিশুর আছে কি কোন স্বপ্ন!

নিজে ঘুমাও আরাম আয়াশে,
সকাল বিকেল কাটে সবার সাথে।
ভেবেছো কি কখনো বন্ধু,
বৃদ্ধাশ্রমে থাকা পিতামাতার কথা।

নিয়মিত পরিবেশনা চলছে আহা কতো,
নতুন নতুন রেসিপি খেতে কতো মজা।
ভেবেছো কি কখনো বন্ধু,
অসহায় না খেয়ে থাকা মানুষের ব্যথা।

পড়ছো তুমি নামিদামি ইউনিভার্সিটিতে,
বুদ্ধি তোমার তৃপ্তি ভরা কতো।
ভেবেছো কি কখনো বন্ধু,
শিক্ষার অভাবে নষ্ট হওয়া ফুলের কথা।

কতো টাকা করো খরচ,
কতো সুন্দর সাজো তুমি আহা।
ভেবেছো কি কখনো বন্ধু,
কতো করছো খরচ গরীবের তরে।

সংশয়

এ. বি. এম নাজিম বিল্লাহ
ছাত্র, দা' ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, IIUC

সারা বিশ্ব জুড়ে যখন সদা হুমকি
আমরা কি পিছনে ফিরে দাঁড়াব থমকি?
মোরা বিশ্ব অঙ্গনের সাহসি যুবক,
মোরা নাকি জাতির ভবিষ্যৎ।
তবে কেন এই অরাজকতা সারা বিশ্বময়?
মোদের অন্তরে সদা হুমকির সংশয়।
আর করোনা, শান্তির এ বিশ্বকে অশান্ত।
একথা ভুলোনা আমরা জাতির ভবিষ্যৎ।
বিশৃঙ্খল করোনা মোদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে,
বাঁধা দিওনা শৃঙ্খলভাবে বেড়ে উঠতে।
মোদের সৌরভে বিশ্ব হবে সুগন্ধময়,
পথ চলতে আর কোনোদিন থাকবে না সংশয়।

মমতাময়ী মা

মুহাম্মদ উযাইর কুতুবী
শিক্ষক-আইডিয়াল মাদরাসা চট্টগ্রাম।

মা তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে
আমার প্রাণ ভরে,
মা তোমাকে ভাবতে ইচ্ছে করে
আমার মন ভরে।
তোমার মায়া মমতায়
উঠেছি আমি বেড়ে,
তোমার নামে গাইবো সুরে
স্রষ্টার দেওয়া কণ্ঠ ছেড়ে।
আমি ছিলাম অন্ধ ঘরে
এনেছ তুমি আলোর ধারে,
তোমার সোহাগ ভালবাসা
নিয়েছে আমি কেড়ে।
মা আমার তনু করে ছল্ ছল্
থাকতে তোমার পাশে
আমার অস্থির মনে স্বস্তি মেলে
থাকলে তোমার কাছে।
মা আমি জানি তোমার মাঝে
মধু আছে মিশে
আমার গানের ভাবনাগুলো
কভু নহে মিছে।
আমি যখন ছোট্ট ছিলাম
নিয়েছ আমায় কোলে তোলে,
রাত-নিশিতে নির্ঘুম ছিলে
দোলনায় আমায় দোলে দোলে।
তোমার মুখে দাওনি খাবার
দিয়েছ আমার থালায় তুলে,
ভাল পোশাক দাওনি গায়ে
রেখেছ আমায় পুষ্প ফুলে।
যখন আমি রুগী হতাম
অশ্রু দেখতাম তোমার চোখে,
যখন আমি সুখি হতাম
হাসি পেতাম তোমার মুখে।
মা তুমি আমার জন্য কর দোয়া
দিবস-রাত্রিতে,
যেন তোমায় রাখতে পারি
সুখে-শান্তিতে।

বেস্টফ্রেন্ড

তাসফিয়া ইসলাম মারিয়াম
১০ম শ্রেণি-আইডিয়াল গার্লস মাদরাসা চট্টগ্রাম।

যদি জিজ্ঞেস করেন- বেস্টফ্রেন্ড কে?
উত্তরে বলব-গুনাহ থেকে দূরে থাকে সে।
গুনাহ সে নিজেও করে না, করতেও দেয় না,
সদাচরণ শিক্ষা দেয় সে।
বেস্টফ্রেন্ড সদা থাকিতে চাহে না সাথে
দূর থেকে দোয়া করিতে থাকে সে।
কথায় ও কাজে করেন না বিরক্ত,
প্রয়োজনে পারে দিতে নিজ রক্ত,
সুখের চেয়ে দু:খের সময়
পাশে থাকিতে চাহে সে।
ক্ষণিকের অতিথি কভু হয় না বেস্টফ্রেন্ড
বেস্টফ্রেন্ড হয় শুধু রবের ক্ষমাপ্রার্থী।
দিবানিশি সে জন, করে শুধু ক্রন্দন,
কথায় যেমন তেমনি কাজে, থাকিতে চাহে প্রতিক্ষণ।
সৃষ্টির মাঝে সে খুঁজে রবের মহিমা,
প্রশংসা করে শুধু, করে না কো গরিমা।
রিয়া থেকে দূরে রয়,
করে না সময় অপচয়,
সৃষ্টির তরে কাজ করিতে চাহে সে,
তাইতো বলি মোরা বেস্টফ্রেন্ড সে।

হলদে বুনোহাঁস

মাসউদ ইকবাল
সাবেক ছাত্র, দাওয়াহ বিভাগ, আইআইইউসি

আমি থমকে দাড়াই গহীন বনের মাঝে...
আমি ঘুরে ফিরি সকাল-সন্ধা-সাঝেঁ...!
আমি চিতায় পুড়ে যাওয়া চন্দন কাঠ...
আমি রাতের নিস্তব্ধতায় শিশির ভেজা মাঠ...!
আমি কৃষকের কপলে লেপ্টে থাকা ঘাম...
আমি দেয়াল চাপা পড়া খুনের দাম...!
আমি অশ্রু লুকিয়ে হাসা মায়ের আচল...
আমি নিরিহ বাবার অনুভূতি হারানো দেহ হিম শীতল...!
আমি মহান স্রষ্টার অবাধ্য পথহারা সৃষ্টি...
আমি হঠাৎ নিভে যাওয়া লোচনের নির্বাক দৃষ্টি...!
আমি সাগর তীরে পড়ে থাকা নিথর লাশ...!
আমি সদ্য ডিম থেকে ফুটা হলদে বুনোহাঁস...!
আমি ভুলে গেছি আজ হুংকার দিতে নারায়ে তাকবির ...
আমি নরকে চলা দিকভ্রান্ত অবোধ মুসাফির...!

আইআইইউসিতে দা'ওয়াহ বিভাগের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগের নবীণ বরন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৬ অক্টোবর শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদ ভবনে দা'ওয়াহ ক্লাবের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ক্রেস্ট দিয়ে বরন করে নেয়া হয়।

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মাদ আমিনুল হক এর সভাপতিত্বে দা'ওয়াহ ক্লাবের সভাপতি জনাব অ ফ ম নুরুজ্জামানের সঞ্চালনায় নবীণ বরন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ড. আবু রেজা মুহাম্মাদ নিজামুদ্দীন নদভী। তিনি তার বক্তৃতায় আইআইইউসি ও দা'ওয়াহ বিভাগকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এবং ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞানসমৃদ্ধ পড়াশুনার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বই পুস্তক পড়তে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এ সমস্ত বই পড়লে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক আসল ইতিহাস জানা যাবে। তিনি আইআইইউসির শরীয়াহ অনুষদের মত এরকম সমৃদ্ধ অনুষদ বাংলাদেশের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই বলেও মন্তব্য করেন।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শরীয়াহ অনুষদের ডীন ড. শাফী উদ্দীন মাদানী, প্রফেসর আতাউর রহমান নদভী

আইআইইউসির ১৩তম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সম্পন্ন

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে আইআইইউসির ১৩তম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আন্তর্জাতিক এই কনফারেন্সে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাই, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৫ জন কি-নোট স্পিকার ছিলেন। কনফারেন্সে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়ার এশিয়া-ইউরোপ ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ড. রাজা আল রাসিয়াহ, ইউনিভার্সিটি সেইন্স ইসলাম মালয়েশিয়ার প্রফেসর দাতো ড. সাপোরা সিপন, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব হাল এর বাণিজ্য, আইন ও রাজনীতি অনুষদের প্রফেসর ড. গুঞ্জন সাকসেনা, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. হাসানুদ্দিন আবদ আজিজ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইনবা ইউনিভার্সিটির টেকসই ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ড. জং দ্য কিম। কনফারেন্সে মোট প্রাপ্ত প্রবন্ধের সংখ্যা ১১০টি। তন্মধ্যে ৬০টি প্রবন্ধ কনফারেন্সে উপস্থাপিত হয়েছে

কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে দেশে ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৪৭ সালে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ২০৪৭ এখনো আসে নাই, বর্তমানে দেড়শ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের আছে। সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার দরজা আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। কোনো বাধা নেই। চিন্তার জগতে বাধা নেই, কাজের জগতে বাধা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি বলেন, আমরা কোনো ধনী রাষ্ট্র নই, আমাদের তেমন কোনো সম্পদও নেই। তবু প্রধানমন্ত্রী চান শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে আমরা সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করি। এক্ষেত্রে আমরা প্রচুর ব্যয় করছি, আরো করবো।

আইআইইউসির উপাচার্য প্রফেসর কে এম গোলাম মহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আবু রেজা মো. নিজামুদ্দীন নদভী এমপি। বক্তব্য রাখেন আইআইইউসির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী, বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমের আলী হোসাইন। কনফারেন্সের অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ার আইআইইউসির ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবদুল হামিদ চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান খান, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ মাসরুরুল মাওলা এবং মেম্বার সেক্রেটারি ড. মো. মাহি উদ্দিন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইআইইউসি ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজের সদস্য মুহাম্মদ নূরুল্লাহ প্রমুখ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বলেন, বৈশ্বিকভাবে পলিসির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। অর্থায়ন এখন একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া এবং একাডেমিক বিষয়। এই কনফারেন্স জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানের সম্মিলন। এখান থেকে ভাল সুপারিশ বেরিয়ে আসবে। একটা সমতার সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সুপারিশ কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী বলেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব উন্নয়নকে ধ্বংস করে এই বিষয়টাকে বিবেচনায় এনে নতুন কিছু উদ্ভাবনের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

উপাচার্য প্রফেসর কে এম গোলাম মহিউদ্দীন বলেন, শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ও গবেষকদের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন প্রয়োজনীয় লার্নিং প্ল্যাটফরম হিসাবে সুফল বয়ে আনবে। সমাজের কল্যাণে একটা প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়নে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কুইজে অংশগ্রহণের নিয়মাবলী

১. যে কেউ এই কুইজ কনটেস্টে অংশ নিতে পারবেন।
২. কুইজের উত্তর ইমেইল অথবা ডাক যোগে পাঠানো যাবে।
৩. কুইজের উত্তর প্রতি ইংরেজী মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে পৌছাতে হবে।
৪. কুইজের প্রশ্ন মাসিক দা'ওয়াহ এর সংশ্লিষ্ট সংখ্যার বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে করা হবে।
৫. প্রথম স্থান অধিকারীকে এক বছরের জন্য ফ্রি মাসিক দাওয়াহ পত্রিকা প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে যথাক্রমে ছয় মাস ও তিন মাসের ফ্রি পত্রিকা দেয়া হবে।
৬. প্রশ্নোত্তরের সাথে অবশ্যই বিস্তারিত নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

গত সংখ্যার উত্তর

১. খুব সহজেই অপরাধ।
২. রবের।
৩. ১৮৫১ সালে "আরবাঈন ফী আহওয়াল আল-মাহাদিয়্যাহ" বইয়ে।
৪. বর্মি সেনানিবাসে রূপ।
৫. শিরকের।
৬. আবু তালহা।
৭. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহ.)।
৮. এক ধরণের রাসায়নিক বস্তু।
৯. শরীরের বৃহত্তম হাড়সমূহের রাবারি টিস্যুই হচ্ছে বোন মেরু।
১০. যুগোপযোগী কার্যক্রম প্রণয়নই আলেমদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যারা বিজয়ী হয়েছেন-

১. তানজিলা আক্তার আসমা, ৯ম শ্রেণী, আল হুমাইরা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা।
২. ফারজানা ইয়াছমিন (মুন্নি), ৯ম শ্রেণী, আল হুমাইরা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা।
৩. মাসরুর উল আলম, ৭ম শ্রেণী, হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।
৪. মাহদিয়া জাইমা, ২য় শ্রেণী, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল।
৫. শাহাদাৎ হোসেন, ফার্মাসি বিভাগ, আইআইইউসি।

এ সংখ্যার প্রশ্নাবলী

১. মানব জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তিনি .... পেশ করে গেছেন।

২. সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজের বাধা দান ঐচ্ছিক বিষয় নয় বরং এটি ....অনুযায়ী ফরয।

৩. রাসূল (সা.) কে অবমাননা করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর ঃ

৪. ছোট্ট মেয়েটার অনুরোধে .... খাবারটুকু তৃপ্তি ভরে খেলেন।

৫. আমাদের গোয়াল ঘর থেকে .... নিজ হাতে নিয়ে বালতির পানিতে মেশানো শুরু করল।

৬. ইসলামী স্কলাররা সাংবাদিকতা ও মিডিয়ায় কাজ করাকে কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?

উত্তর ঃ

৭. খাবার যোগাড় করতে পারা যেমন একটি .... তেমনি খেতে পারাও .... ।

৮. গ্রানাডার .... স্কোয়ারে পোড়ানো হয় দীর্ঘদিনের তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি ভলিউমে লেখা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির বই।

৯. ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যাবে কি?

উত্তর ঃ

১০. "খুব ভালো করে যখন আমি দেখলাম, বুঝলাম এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদী হতে পারে না" এই বক্তব্যটি কার?

উত্তর ঃ

নাম: ....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ....

শ্রেণি: .... **সদস্য নং:** ....

* সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১ ইংরেজি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।

* উত্তরপত্রটি স্ক্যান করে মেইল করতে পারেন। ই-মেইল: monthlydawah@gmail.com